



১৩৭৮

সরকার
প্রতিষ্ঠিত



॥ গল্প ॥	ছোটদের বই	॥ ছড়া ॥
পর্যন্ত চট্টোপাধ্যায়	উপেক্ষাকিশোর রায়চৌধুরী	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ছেলেবেলার গল্প ১'০০	ছোট্ট রামায়ণ ১'৫০	শিশু-কবিতা ১'০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	টুনটুনির বই ২'০০	অন্নদাশংকর রায়
একে তিন তিনে এক ৩'০০	গল্প-সংগ্রহ ২'০০	ডালিম গাছে মো ২'০০
হানাবাড়ির কারখানা ২'৫০	সেকালের কথা ১'৫০	রাঙা ধানের খই ২'০০
সত্যীকান্ত গুহ	মহাত্মারতের গল্প ৪'০০	বৃহৎ বহু ৩'০০
বেচার হাতি লকীনাথ ২'০০	সেকাল ও একালের গল্প ২'০০	দারো মাসের ছড়া ৩'০০
হবোধ ঘোষ	ছেলেদের রামায়ণ ২'০০	শেউকড়ি শখার
পুতুলের চিঠি ৩'০০	॥ উপস্থাপন ॥	হিং টিং ছট ২'০০
শাঙ্ক্য দেবী	ধনসেগোল মৃৎপাখ্যায়	ছাঁদাবাঁধা ২'০০
কেমন জন্ম ১'৫০	চিত্রগ্রীব (অনুবাদ) ২'০০	ধাঁধা
বিহল দত্ত	হেস্তেন্দ্রনাথ রায়	ননীগোপাল চক্রবর্তী
সিংধুড়োর গল্প ২'০০	নীলসারদের	বৃদ্ধি নিয়ে খেলা ৩'০০
কামাকী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	অচিনপুরে ২'০০	॥ নাটক ॥
ইন্দি বর্ণা ৩'০০	যকের ধন ৩'০০	শিবরাম চক্রবর্তী
এমিলের গোলেন্দ্রাবাহিনী	অন্নদাশংকর রায়	পণ্ডিত বিদ্যাস
(অনুবাদ) ৪'০০	পাহাড়ী ১'৫০	মায়া ভাগনে ৭৫
লীলা দত্তগুপ্ত	বিক্রিকরণ মনোপাখ্যায়	সম্পাদকের বিপদ ১'০০
চাকার গাড় ১'৫০	মরণের ডঙ্কা বাজে ৩'০০	॥ ভ্রমণ ॥
তুমারকান্তি ঘোষ	বিশ্ব মৃৎপাখ্যায়	অন্নদাশংকর রায়
জিহ্না কাহিনী ৪'০০	গুপ্ত কিউরিয়সিটি শপ	ইউরোপের চিঠি ২'০০
জিহ্না কাহিনী ৪'০০	(অনুবাদ) ২'০০	

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বাম্বয় চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভারতের ভাস্কর মূর্তি নেতাজীর

পত্রসমূহের সংকলন

(পরিমিত ও পরিমিত ২য় সংস্করণ)

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিখ্যাত পুরুষ, বিবেক প্রোতাপকর সাংগামী
স্বদেশপ্রেমের উচ্চতম ব্যক্তিগত চরিত্রের, দীর্ঘদিন বিপ্লবী মনের ও উদ্ভিষ্ট
সাম্প্রতিক জীবনের বক্তব্যবহিষ্ট কাহিনী যে অসংখ্য পত্রসমূহের মধ্যে
মূর্তি হয়েছে তাই তৎসমূহ ঐতিহাসিক সংকলন এই গ্রন্থ।

পত্রাবলী

মুদ্রিত ও মুদ্রিত -

পৃষ্ঠা সংখ্যা
৩২৬
পত্র সংখ্যা
২৪৭

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষে
শিখিরকুমার বসু
কর্তৃক
সংকলিত

পত্রের অঙ্কসিপি
ও চিত্র ৬ বানি
মূল্য
১২.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বাম্পা চাটুজো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছেলেমেয়েদের সর্বপুৰাতন মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'-এর গৌরবোজ্জ্বল
পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় প্রকাশ

নানাবিধ শতাধিক বৈচিত্র্য-
পূর্ণ রচনা সংবলিত ভবল
ক্রাউন ৮ পেন্সি সাইজের
হৃৎহৃৎগ্রন্থ। উৎকৃষ্ট
কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ
ও সোনার কলে মুদ্রিত
হাশে ভদ্র প্রচ্ছদ পট।

জয়ন্তী
মৌচাক

আপনার ছেলেমেয়েদের
মৌচাকের বার্ষিক বা
মাসিক গ্রাহক করে
লিখে, স্বল্পমূল্যে এই
অনবদ্য ও শোভন রচনা-
সমৃদ্ধ সংকলনটি সংগ্রহ
করুন, ব্যবহার করে দিন।

মূল্য : আট টাকা

মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকারা প্রতি টাকায় ২৫ পরমা কমিশন পাইবেন

জীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

। নূতন তথ্য ও ভাষায় এক অনিন্দ্যসুন্দর জীবনী ।

গৈরিক বসনে কি উজ্জল রূপ, রেখ একবার তাকিয়ে ! মৃত্যুত মন্তকে কি সৌম্য
শোভা ! কি উদারশাস্ত শব্দকণ্ঠ ! বলিষ্ঠ, মোহনক, উজ্জ্বলী, অখণ্ড নিবেদন মত সন্ধানক,
পরিচাল প্রিয়। অপার অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। করেন থেকে তদ্বৎসল কণ্ঠহ।
বৈদ্যস্বপ্নর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক পাকাতা দর্শন ও বিজ্ঞান মধ্যপর্ণে। স-প্ত অদ্বতা ও
অস্বপ্ন উপর বজ্রাহস্ত। সংস্কৃত বহন মুক্ত করতে এক প্রেমে বন্দী। সে তাঁর স্বতীত্ব বেশপ্রেম
কীবাগ্নে। বিদ্বৎ শিখার মত বাণী আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত তার অর্থ। সব কিছু মিলে
উজ্জল টেবল-উৎসাহ।

প্রথম খণ্ড : ৭'০০ দ্বিতীয় খণ্ড : ৫'০০ তৃতীয় খণ্ড : ৭'৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৫২শ বর্ষ
২য় সংখ্যা



জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৮

বিবরণ	লেখক-পেনাম	পৃষ্ঠা
১। আম ও আমড়া (কবিতা)	শ্রীবিবনাথ ভট্টাচার্য	৫৭
২। সন্ন্যাসীর গল্প (গল্প)	শ্রীমতী রাণী দ্বার	৫৯
৩। বাঙালীর ও বাঙালী (জন্ম কাহিনী) ...	শ্রীমতী আভা পাকড়া	৬২
৪। ছড়া (ছড়া)	শ্রীপলাশ মিত্র	৬৫
৫। সবগাঙ্গা (গল্প)	শ্রীমলিনী কুমার ভট্ট	৬৬
৬। মধুর সমরে (ঐতিহাসিক)	শ্রীম এ্যানন্দ ভট্টাচার্য	৭২
৭। হাতে হাতে অগ্নি (কবিতা)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	৭৫
৮। বিধেবৈরাগ্য (জীবনী)	শ্রীচন্দ্রনাথ রায়	৭৬
৯। পিপড়েবের গুণ (কবিতা)	শ্রীঅনিলকুমার দ্ব্যোপাধ্যায়	৭৮
১০। কবি-সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব (জীবন-কথা)	শ্রীঅমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯
১১। অধর্মের ঐচ্ছিক (উপন্যাস)	দ্বন্দ্বনন্দ	৮১
১২। রক্তরাগ পথে (উপন্যাস)	শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪
১৩। টোকাতে দেবানো মজার গল্প (ব্যঙ্গিক) ...	শ্রী এ. সি. সরকার	৮৬
১৪। গল্পের হাতে (কবিতা)	শ্রীপূর্ণেন্দু সিং	৮৭
১৫। বেলপুলা	মহুড়	৮৮
১৬। নতুন বই বই		৯২
১৭। ধর্মের পাতা		৯৩
১৮। মধুচক্র	মধুবি	৯৪

• মৌচাকের নিয়মাবলী •

১। মৌচাকের বার্ষিক চাপ ৭০০ টাকার আনুমানিক এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ০.৩০ পয়সা। বৈশাখ মাস হতে বঙ্গ আদায়। তবে মে, জুন ও মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। কোন সংখ্যা না পেলে সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে জানাতে হবে, মতো উক্ত সংখ্যা পাওয়া যাবে না। টিকানা পরিবর্তন করতে হলে পূর্বমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জানাতে হবে। চিঠি পর মনিমটার রপনে সবসময়েই গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকে। গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ না থাকলে চাপা জমা করা সম্ভবপর হয় না। নতুন গ্রাহক হলে 'নতুন' কথাটির অবশ্যই উল্লেখ থাকে সরকার

৩। লেখা সকল সময়েই মকল বেখে পাঠাতে হবে। 'অমনোনীত' রচনা ফেরত পাঠাবার জন্য সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যিক। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও টিকানা না লেখা থাকলে সে লেখা গ্রাহ্য হয় না।

৪। এপ্রেলের ৩০ ১০ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয় এবং কমপক্ষে প্রতি সংখ্যার ১০ কপি করে প্রতিকা নিতে হয়। প্রতি ৬ মাস অগ্রিম বিক্রিত কপির হিসাব ও অবিক্রিত কপি ফেরত পাঠাতে হয়। কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।

স্থানো
ড্রইং এর
কালি

স্বলেখা

প্রতিদিনের প্রায়োজার

স্থলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর
কালি

অ্যাডসল

অফিস
পেস্ট
ও গাম

সিক্যুরিটি

সিলিং
ওয়াশ

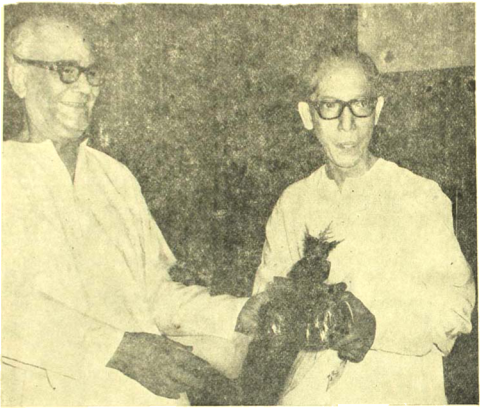
স্থলেখা

স্ট্যাম্প প্যাড

স্বলেখা

ওয়ার্কস্ লিমিটেড

স্থলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২



১৩৭৮ সালের 'মৌচাক পত্রিকা' কর্তৃক প্রদত্ত 'স্বধীরচন্দ্র পুরস্কার' পাচ্ছেন
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পুরস্কার দিচ্ছেন শ্রীপ্রবোধকুমার দাস্তাগল।

ফটো : স্বকুমার রায়



৫২শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৮

[২য় সংখ্যা

আম ও আমড়া

শ্রীবিদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আম গাছে আর আমড়া গাছে লাগিয়ে দিল বৃন্দ,

আম জাতি'র শ্রেণী বিভাগ এবার থেকে বন্ধ ।

“আমরা যে আম,” আমড়া কহে, “এটাই হোল সত্য,

দেবছ পেটুক 'ড়া' আমাদের, ওটুক নহে কথা ।

আম্র এবং আমড়া কেনো একই রকম বল,—

একই বনে বসত করি, 'আম' হয়েই লজ্জা ।

ওইটুকু ওই 'ড়া' কথাটি নেহাত যেন ফালতু ;

'ড়া'টুক ছেড়েই 'আম' আমরা নয়তো কারো পালতু ।

পেটুক জনের ফলার দিতে পাকা আমের ভোজ্য ;

আমরা সবাই আমড়া বলে করব না এ সজ্জ ।

আমের সাথেই উঠব পাতে আমরা সবাই আমড়া—
মাংস মশুস নাই-বা খেলো দেখুক চেটে চামড়া।”

আত্র কহেন, “ভালেই হোল আমড়া হলেন পক্ষে ;
বিপদ আপদ এলে সবাই পরস্পরের রক্ষে।

অনেক গলদ জাত-বিভাগের সমাজ এতে ছুটে,
আমরা সবাই একক হয়ে সবাই হব পুটে।

কিন্তু দেখি, আমার দলে কেউ তো নহে কম ভাই,
লেংড়া, কুতো, ফজলী, দেশী, কালাপাহাড়, বড়াই।

আমরাও যে অনেক জাতি, কোন দলেতে মিশবে ?
শূণ্যের বিচার ঠিক না হলে পায়ে কেলেই পিষবে।

শূণ্য বিচারে কিংবা স্বাদে বাদের দেখে মিষ্টি,
ভাদেরই লোক আদর করে, ভাদের দিকেই দৃষ্টি।

কিন্তু যখন টক্টা হবে কিংবা হবে চাটনি,
কদর ভখন কাঁচা আমার, ভাদের যত খাটনি।

তোমারও তো খাতির আছে মুন-মিঠাতে জমলে,
আমড়া কোথায়—খুঁজবে লোকে চাটনি এবং অরে।

যেইখানেতে যার প্রয়োজন, সেইখানে তার মূল্য,—
নিজের কাজের ওজন বুকে উচিত থাকা সূত্র।

একের মতন নয় অপরে, সবাই হেথা ভিন্ন ;
যোগ্যতাটাই প্রধান কথা, সেটাই জাতির চিহ্ন।

কম কেহ নয় এই জগতে বুধাই কর হুঃখ,—
কাজের গরজ যার যেখানে সেইখানে সে মুখ্য।”

সন্ন্যাসীর গল্প

শ্রীমতী বানী রায়

• •

আজকাল রাষ্ট্রবিপ্লব, পুনরুত্থানের
দিনে আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'সন্ন্যাসী
উপক্লেষের' কথা লিখতে বসিনি। বাইরের
দুশ্বাসে যখন এত দুঃখবিগ্রহ, এত অশান্তি
তখন ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা
আত্মীয় লোক হানা দিয়ে খাবা বসিয়ে
যায়। একজন সন্ন্যাসীর কথা তোমাদের

জানিয়ে দিচ্ছি। হলনা কত রকমে আসে জানলে তোমরা সাবধান হবে। ঘটনাটি কিন্তু
একদম সত্য।

আমার বড়বোহির অবেতুক প্রীতি সাধুপুঙ্ককে। সেদিন বাড়ীর বাইরে থেকে বাড়ী
ফিরে দেখি, বাইরের একটা ঘরে আসন পেতে এক পেকরাখারী ভোজনে বসেছেন।
মাথায় জটায় বোকা, হাড়ি কোমর পরন্ত। গলায় স্বেদে ঝাঁটা আর এক জটায়ারী
ছবি, কস্তাক মালায় পাঁখা। কপালে রক্তচক্ষুর ত্রিশূল আঁকা। পায়ে তন্দ্রা মাখা।

বৌদি ও তাঁর পুত্রবধূ দু'জকে বসে সাধরে সন্ন্যাসীকে পাওয়ারাচ্ছেন। বারান্দায়
আমার দাধা ও ভাইপো বিরক্ত ভাবে বসে আছে কইনটু করে চেয়ে।

আমি বাড়ীর মধ্যে চলে এসে। পরে বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে তখনলাম যে,
ইনি তারানীটে গুজর নামে আশ্রম করবেন বলে টাকা তুলছেন। বিগ্রহেরে সুখার
উল্লেখ হয়েছে। তাই আশ্রমের বাড়ী দয়া করে অতিথি হয়েছেন। আর বেশী কিছু
মানলাম না।

সন্ধ্যায় আশ্রমের প্রতিবেশিনী হাসি সেন বেড়াতে এলেন। আমি বললাম,
“বাড়ীটা এখন মাথড়া করে ফিলেই হয়। রোয়ে তেতেপুড়ে বাড়ী ফিরে দেখি বসবার
ঘর ছুড়ে এক বিটকেল সন্ন্যাসী খেতে বসেছেন। হাড়ির ভাত ফুরিয়ে গেছে। আবার
রাধা হলে এত বেলায় খেয়ে উঠলাম। পরীরটা ম্যাল'ম্যাড্‌ করছে।”

হাসি সেনও বিলম্বন বৈজ্ঞান সন্ন্যাসী মেনে থাকেন : তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,
“কেমন সন্ন্যাসী!”

সমস্ত বর্ণনা শুনে ওর তো গালে হাত! উনি বললেন, “একি, সেই সন্ন্যাসীটা
আবার সর্বনাশ করে গেছে সেদিন। আপনার বৌদির কি কি গেল?”

আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, “কি রকম? কি হয়েছিল?”

হাসি সেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতার পন্নটি বললেন :—

"আমি সকালবেলায় ঘরে ভাঁড়ার দিছি। তেতালার দিড়ির মুখে বেথা দিল ওই সন্ন্যাসী। ঠিক এই পরটাই করে বলল, 'মা, তুপুরবেলার ভুটি ভাত দিন আমাকে।' আগে আমার বিষয়ে, আমার ছেলের বিষয়ে ক'টা সত্যি কথা বলে দিন। আমার কেমন একটা বিবাস হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "পাড়ার ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আপনার বাড়ীর বিষয়ে কিছু জানা আশ্চর্য কি?"

হাসি সেন বললেন, "তখন তো অভ্যস্ত বৃত্তে পারিনি। অবশ্য নীচের ডাঙাটোয়ের দায়েরায় বলেছিল যে, এই লোকটা বাড়বান্ন, ডেজি জানে। আমি ও হিন্দুখানী বুলিতে কি বলছে কান দিটিনি। অবিক্তি আমি বলেছিলাম, 'পরমা নিয়ে যান।' কিন্তু সন্ন্যাসী রাঙী হ'ল না। আমারও কেমন ভয় হ'ল, তুপুরবেলা অতিথিকে ফেরা? সন্ন্যাসী মাহুদ, শাপমসি দিয়ে যাবে। একমাস আগে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। নুতন বৌ-ই বা কি ভাববে? তাই বললাম যে, 'বাবা, বহন ভাত চড়াই।' সন্ন্যাসী বলল, 'মা, আমি ঘুরে আসছি।' একটু পরেই কিরে এল। বদবার ঘরে বললাম ওকে নিয়ে আমি আর আমার ছেলে। বলল, 'মা, আমি আপনার ঘর আশীর্বাদ করছি, দৈবশক্তি দিছি। আপনার ছেলের খেটু কীড়া আছে, কেটে যাবে।'

কি-টা দাঁড়িয়ে ছিল দরবার কাছে। ওকে বলল, 'চাট ময়দা নিয়ে এস।'

কি ময়দা এনে দিলে দরজাটা। ডেজিরে হাতের মূঠোর ময়দা একটু রগড়ে বলল, 'কমাব্যায়ের নির্মাল্য হয়ে গেছে। খান।'

আমার ছেলে আর আমি মুখে দিয়ে দেখি সেকি ব্যা! তারপরই যেন কেমন—কেমন হয়ে গেলাম আমরা। সন্ন্যাসী বলল, 'মা, সূক্তমেলার দাছি। একখানা কবল দে দেখি।'

আমি বললাম, 'বাবা, কবল একখানা আছে বটে, কিন্তু আমাদের ব্যবহার করা।'

'তাহলে টাকা দে। কিনে নেব। চলি টাকা দে।'

আমি যেন মথের ঘোরে উঠে শোবার ঘরে গেলাম।

আলমাত্রী খুলে টাকা বার করে এনে হাতে বিলায় সন্ন্যাসীর। ছেলে লড়ভরতের মত বসে আছে।

সন্ন্যাসী বলল, 'এসব কথা এক সপ্তাহের আগে কাউকে বলবি না। ফল হবে না দৈবশক্তির।'

তারপরে আমাকে বলল, 'হাতের বাঙ্গাটা দে।'

আমার একহাতে মোটা নিরেট সোনার বালা ছিল, অস্ত্র হাত ভাগি খালি ছিল।

আমার হাতখানা। দুচুড়ে কথা
বলার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বালাটা
পুলে নিয়ে বোলায় তরে বলল,
'আমি যাচ্ছি। এ সব কথা কাউকে
বলিল না কিছু।'

সে বেরিয়ে দিবি। সিঁড়ি বেয়ে
নেমে রাস্তার চলে গেল। আমি
আর ছেলে আজকের মত কিছুক্ষণ
বসে থেকে আশে পাশে বারান্দায়
গেলাম।

আলস্যের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম
মোড় পেরিয়ে সে চলে গেল।
আমরা দু'জনে বেন অগ্নে-চমা
যা হু বের মত হয়ে আছি। কি
করছি বুঝি না।

এমন সময়ে আমার ছেলের
থোঁ টুকটুক বারান্দায় এসেছে।
আমাদের অমনি ভাব বেঁধে সে

টেঙিয়ে উঠে আমাকে কঁাঁহুনি দিল, 'ওমা, একি? তোমরা এমন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

তখন আমরা চমক ভেঙে হু হু হলাম। কিন্তু ততক্ষণ সন্ন্যাসী হাওয়া হয়ে গেছে।

গল্প শেষ করে হাসি দেন বললেন, "আপনার বোধির কোন জিনিস গেল?
ডাকুন ঠেকে, গুনি।"

আমাদের জেরায় বোধি আমৃত্যু আমৃত্যু করে বললেন যে, "কয়েকটি টাকা পেছে
মাত্র। অবশ্য বারান্দা থেকে দাঁড়া ও ভাইপো নড়েনি, চোখ রেখেছিল ঘরের মধ্যে
সন্ন্যাসীর দিকে আগাশোড়া।"

হাসি দেন বলেন, "ভাই বড় কিছু বাওয়ার থেকে বেঁচে গেছেন। প্রসার বলে
কোন অসুখ বাইরে আজ্ঞার করে দিতে পারেনি।"

মোড়াকের পাঠকপাঠিকারা, এটা কিন্তু সত্যি গল্প।



রাজপীর বা রাজগৃহ

শ্রীমতী আতা পাকড়াই

তোমরা রাজপীরের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! কলকাতা থেকে তো বেণী দূর নয়! অনেক
হস্ত সিরেও থাকবে! কিন্তু আমরা খাঁকি পতিমে। ওদিককার অনেক লব জাহাণা বেধে
এসেছি। তুর্দার গরম পড়ে পতিমে তা তো জানাই। তাই গরমের সময় 'সু' এড়াতে সাহায্যে
ছুটেছি! দিমলা, মুনোত্তা, বৈনোতাল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও কিছুতে যেন আর এই রাজপীর
বেধা হয়ে ওঠে না।

সেই যে কবিতার আছে—

“যেথা হয় নাই চন্দ্র মেলিয়া

যে হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিখের উপরে

একটি শিলির বিন্দু।”

ঠিক সেই ব্যাপার আর কি!

রাজপীর বেধতে এসে কিছু আমরা এই বিন্দুতেই নিব্বু দেখলাম! তার জমির ওপারে
যা আছে তা আছে, কিন্তু এই রাজপীরের মাটির নীচে তরে তরে যে রাজগৃহের রাজধানীর
ইশারা রয়েছে সে যেন রূপকথার গল্প! শুনলে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে!

ভিসেবর মাস। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা খাচ্ছি। তুফান—সকাল সাড়ায় পৌছে দিল
বক্তারপুত্রে। তখনো নীতের আকাশে আলো কোটেনি! বক্তারপুত্রে থেকে বাস আর ট্রেন
দুই-ই রাজপীরে যায়। ট্রেনগুলি ছোট ছোট যেন খেলনা-বাড়ী। শুনলাম ওদের পৌছবারও
কোন সময়ের ঠিক নেই। বাসই ভাল—সর্দারজী ডুইডার বলল—আরে ইয়ে যদি গাড়ি সে
মেরা হাওয়াই ভাড়াৎ বহোৎ পরেলে পরেলেগা সাহাব! রত্নের দতিতে বাস চলল—ও: কি বড়-
বড় আওয়াজ! লম্বা টানা বেকির মত সিট! আবার পাশে একজন বৃদ্ধ ভ্রমলোক বসেছেন—
নাম বললেন, মি: কুটরিয়ানী। নামটা শুনে আমার ছোট দুই ছেলে মিটকে মিটকে হাসছে
আর ওপাশে তার বাবাকে যেন কি বলছে। কিন্তু ভ্রমলোক সেই বাসের বিকট শব্দ অগ্রাহ্য
করেই আমাদের সুবিধের জন্য অনেক নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া এই রাজপীরের ঐতিহাসিক
প্রসিদ্ধির কথা শোনালেন। ভ্রমলোক একজন রোড কন্সট্রাক্টর কিন্তু আসলে বোধ হয় গ্রন্থ-
তত্ত্ববিদ! যেনে মাটির নীচে কত কি আছে সেইসব দিকেই ওনার আগ্রহ। বললেন, রাজপীরে
তিনটি পর্বার বা গুর রয়েছে!

(১) মহাভারতের রাজা জয়সিদ্ধ। এখানেই মঙ্গল্যে তীব্র জয়সিদ্ধকে বধ করেন।
মন মন দুধ ঢেলে নগ্ন করা সেই মঙ্গল্যমি আগুও সাধা হয়ে রয়েছে। আর আগে রথের চাকার

দাপ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পার্থের সাহায্যি হয়ে এসেছিলেন এট মন্ত্রযুক্ত বেগতে। (২) নৃশতি বিদিসার। বৃদ্ধের বিদিসারকে নীক্ষা দেবার ভায়গা সেই গৃহকূট পর্বত। অজাতশত্রু রাজী হলেন। বাবা বিদিসারকে বন্দী করে রেখেছিলেন সেই জেলগানার। (৩) আর একটি বিষয় হ'ল নালন্দা! মহারাণা কুমার শাল-এর সময় এর প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম শতাব্দীতে, আর এর গঠনকার্য চলে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত।

গয়া থেকে রাজগীর হয়ে যে রাস্তাটি পাটনা গেছে আর যে রাস্তাটির ওপর দিয়ে তখন আমাদের বাস চলছে, সেটি এই মি: কুটরিমানার তৈরী। এই রাস্তা তৈরী করার সময় তাঁর বা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বুকনই তিনি তাঁর নিজের সাবজেক্ট সেই প্রকৃতবে আবার ফিরে গেছেন। বললেন, যেখান থেকেই তিনি রাস্তা খুঁড়তে যান, যেখান, তার তলায় বাড়ী-ঘর। বড় বড় ইমারত। সব রয়েছে। তখন তিনি সে ভায়গা ছেড়ে আবার অন্য ভায়গা খোঁড়েন, সেখানেও সেই ব্যাপার। কোথাও পেয়েছেন ছোট মাঠ বাড়ী, কোথাও লম্বা লম্বা পাথরের চত্বর! হয়তো বাগার ঘোঁসান ছিল সেখানে, কিংবা সার সার মিল্লির ঘোঁসান! মানে, মত্ত মত্ত উছন! বড় বড় সব কাঠের আর লোহার বাসন—এমনি আর কি! তার মতে এখানে ঐ মাটির নীচে চাপা পড়া সব দেখলে মনে হয়, বেশ জমজমাট নহর ছিল এখানে দেকালে। অন্য ভায়গার পেয়েছেন স্থপতির চিহ্ন। বর পুরাকালে মড়া পোড়ার ৯টি আর আঁধি সব নিয়ে নতুন কলসীর মধ্যে পুরে তারা মাটিতে খুঁতে দিত। এমনি ভদ্রভদ্রা সার সার মাটির কলসী তিনি একটা ভায়গার খুঁড়ে দেখতে গেলেন। কোথাও পেয়েছেন নানা আকারের পেতল আর কপোর গহনা, নানা রকম রত্নের পাথর। এখানটা হয়তো স্যাকরা-পাড়া ছিল। অনেক অহুসন্ধান করে শেষে তিনি এই পথের স্তরটি আবিষ্কার করেন। যেখান দিয়ে বাস যাচ্ছে এই রাস্তার নীচে আরো সাত খাক রাস্তা আছে। সব চেয়ে নীচেরটি মেটাল হোড। নানা রকম ধাতু গলিয়ে খুব মজবুত রাস্তা তৈরী করতে চেয়েছে দেকালের মাহু! যাতে কিছুতেই না ভাঙে তাই। তাব তো! অবাক লগে না? কত ধূপ ধূপ এগে মাহু! লোহা গলিয়ে রাস্তা তৈরী করতে চেয়েছে! ভেবেছে, এ রাস্তা শত শত রথ চলেও ভাঙবে না, এমনই মজবুত হ'ল। সেই পথ আরও তাদের পরিজ্ঞান আর মেধার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু তারা কোন মহাকালের গড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে!

পথে আসতে পড়ল গৃহকূট পর্বত। বিদিসার এখানে এসেই প্ররজ্যা নিয়েছিলেন। বৃদ্ধদেব এসেছিলেন তাঁকে দিক্ষা দিতে। এরই ওপরে আছে জেতবন। আর নীচে ঐ শাহাফের পাথরের কাছে মি: কুটরিমানার আগ্রহে ঢুক হয়েছে খননকার্য। মত্ত আমবাগান ছিল এখানে, আর ছিল মটী আত্মশালীর বাসভবন। তারপর দেও প্ররজ্যা নেয়। তখন তাইই কথায় আর বুদ্ধদেবের

নির্দেশে এখানে মস্ত একটি আতুরালয়, যানে হাঙ্গপাতাল গড়ে ওঠে। মস্ত মস্ত কাঠের হাতা, কাঠের বাথ সব পাওয়া গেছে এখানে। হুত রাগবৈভব ঐশ্বর্য বিয়ে ওখানে ঐশ্বর্য তৈরী করতেন ; নরতো সেই আর এক নতী গানবদন্তা ! পড়নি—“কথা ও কাহিনী”তে।—

“নবর ছাড়ায়ে গেলেন রতী বাহির প্রাচীর প্রান্তে ।

গাড়ালেন আসি পরিবার 'পরে,

আশ্রবনের ছায়ায় আঁধারে

কে ভই রমণী গড়ে একবারে তাঁহার চরণপ্রান্তে !”

এই নতীর দারি-ড্রটিকা, যানে দারুণ বদন্ত হোগই হুততো বৃদ্ধবৈবকে এই আতুরালয় প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক হয়েছিল।

মস্ত একটা শুধা দেখলাম। উনি বললেন, ‘সোন ভাণ্ডার’ যানে গুণভাণ্ডার। এটি নাকি বিবিমারের কোথাগার, যানে ধনরত্ন টাকাকড়ি রাখবার লুকোন ভান্ডার ছিল। বৃতীশরা ভিন-মাইট বিয়ে ফাটিয়ে সব ব্যার করে নিয়েছে। ও দেশের লোক বলে ওখানে নাকি এত সোনা হীরে, মণিমুক্তা ছিল যে, তাই বিয়ে রপটা বৃতীশ দাস্তাভ্য কেনা যেত, আর এখনো নাকি আছে ওর মধ্যে সোনা মণিমুক্তা। কিন্তু যে নেবে তার অমঙ্গল হবে তাই কেউ হাত ধের না ! এবার সেই ভরাসঙ্ঘের মল্লভূমি পার হয়ে বাস চলল। সেই যে পড়নি মহাভারতে ? মস্ত মস্ত রথী-মহারথীরা রথে চড়ে এসে, গোল হয়ে বিয়ে গাড়িয়েছেন মল্লভূমি ! ভীমের সঙ্গে ভরাসঙ্ঘের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ভীম প্রায় হেরে যান আর কি ! ভরাসঙ্ঘও মহাবীর ছিলেন তো ! শেষে শ্রীকৃষ্ণ একটি পাতে চিরে ইশারা করলেন, অর্ধান ভীম ভরাসঙ্ঘের দুই পা টেনে ছ’দিকে করে দিলেন। তখন ভরাসঙ্ঘ যারা গেলেন ! তাঁর নাম ভরাসঙ্ঘ কেন হয়েছিল সে গল্প তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো ! সেই যে ছ’ভাগে ভগ্ন হয়েছিল ঐরা ! মরা বলে কেলে বেংরা হয়েছিল তাঁকে—রাটার মরলা কেলার জায়গায় ! তারপর ভরা নামে এক রাক্ষসী যড়া খেতে এসে, কি ভেবে সেই দুটো ভাগ ছেলেকে জুড়ে এক করে দিল, অর্ধনি ছেলে টা) ট্যা করে বেঁধে উঠল ! সেই থেকে ঐরা নাম হ’ল—ভরা-সঙ্ঘ। এঁরাই রাগধানী ছিল রাভগৃহ। এখনো চতুর্দিকে মস্ত উঁচু পাঁচিল রয়েছে। যেন হচ্ছে বেন একটা গড়ের মধ্যে ঢুকলাম। চতুর্দিকে গড়খাই কাটা। আগে ওখান দিয়ে বাগদার চল বইত। বাতে শত্রুতা ভেতরে না আসতে পারে তার ভয়।

দারুণ কাহুনি দিয়ে বাস থামল। ও গার-গতরে ব্যথা হয়ে গেছে ! কিন্তু চারিদিকে অশ্রু বৃন্ত ! ঠিক বেন ইংরেজী সিনেমার বেথা সেই ভাড়াচোরা রোমান শহর। কি বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপ !

জননাম ছেলে বলেছে, চল মা! টঙ্কার উঠবে চল! ও বাবা! এই নাকি টঙ্কা! হোপা প্যাণ্ট! খোড়া! একটা তক্তার চারটে খুঁটি লাগান। নাথার ওপরে নোংরা কাশড়ের চাঁদোরা আর নীচে চারটে ঢাকা! এদিকে রাতাগুলো দেখছি পাহাড়ের রাস্তার মত উচু-নীচু! ভয় করতে লাগল। তবু অগত্যা দুকদুক বৃকে মালপত্র সমেত আমরা তিনজন ভাত্তেই চড়ে বললাম। ছেলে বলল সামনে। তার কাছে বেতের বাঁধেটে আছে জাম, কটি, মাখন আর নারকোল নাড়ু!

এখানে ডরমিটারি বেশ ভাল। সস্তায় খাবার ব্যবস্থা আছে। লেদিকেই যেতে বললাম। রাতাগুলি পিচ ঢালা। সব হালাইলাম। আর তাকনলাম্য এসে ঘুরে গেছেন তখনকার কথা বলছি। কাঠ হয়ে বনে আছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এইবার বৃষ্টি সবস্বচ্ছ সেলাম উটে। কিন্তু বার টঙ্কা সে নিবিকার! সমানে ঘোড়াকে গাল দিচ্ছে আর আমাদের আশাস দিচ্ছে! তবু এখনও কোন দিকে নজর দিইনি! এবার দেখলাম ঘুরে ডরমিটারি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তাটা ভীষণ গড়ানে। গ্রাণ হাতে করে সেই ককি ধরে খুলে আছে। সকলে চোঁচিয়ে উঠল—গেল, গেল, গেল! পড়ে গেছে ঘোড়া! আমি ভাবছি ছেলের নাম ধরে! ভাবছি নিশ্চয়ই ঘোড়ার পেটের ওলায় চাপা পড়েছে সে! ওর বাবা লোক দিয়ে নেমে পড়েছেন। বোকা দেখলাম নীচে থেকে জেলির টিন হাতে ছুটে আসছে। বাবেরট থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে গিরেছিল ওটা। আর ঘোড়াহীন টঙ্কাটা উঁচুতে উঠে গেছে আর আমি পুড়ে কুলছি! অতি কষ্টে কোন রকমে নামলাম। জ্বিন্স-পত্র ছাঁকায়! বেড়িটা ভাল দিয়ে গড়িয়ে অনেক নীচে চলে গেছে! টঙ্কাওলাই সব হুড়িয়ে-বাড়িয়ে এনে দিল। বহুনি খেয়ে স্বীকার করল তার টঙ্কার ঘোড়া আর সে হ'লনেই গাঁইয়া। তবে গ্রাম থেকে এসেছে টাকা কাষাতে। শহরের পথে চলতে জানে না। তাই পতন ঘটেছে। বললাম—খা! খুব হয়েছে, আর টঙ্কার চড়ব না। হেঁটেই যাব। ডরমিটারি ভরা। শেষে ইন্সপেকশন, বাংলোর চমৎকার ঘরে জাহাঙ্গীর মিলল। অনেক চেষ্টার আর প্রচুর পানাদী এসেছে। এখানের উচ্চ কৃতে মন করলে অনেক কঠিন অস্থ পেরে যায়। এই কারণেও রাজগীর বিখ্যাত। তাছাড়া এখানের খাদ্যও চমৎকার খেতে!

ছড়া

শ্রীপলাশ শিত্র

কাগের ছান। বগের ডিল
কাঁঠাল গাছে কুলছে সিম :
সিম পাড়ুলো রাণাল-বৌ
ডালিম গাছে নাচছে মৌ।

মৌ মৌ মৌ মৌমাছি
বাচ্ছা বৃষ্টি আঁজ রাঁচি ?
ঝিকি-ঝুকুর চলবে রেল
জাড়ার মাথায় কাটবে বেল।

সবজাত্য

(অসমীয়া উপকথা)

শ্রীমদীনীকুমার ভট্ট

শিঠে খাবাৰ নথ হৱেছে ফড়িঙেৰ। চাৰী মাহুৰ—অঢ়েল বোৱো ধানেৰ চাল তমা কৰে
 ৭
 ৱেখেছিল ঘৰে। বোকে ভেকে বললে—“এই শেন্দ, আজি ৱাতে সেই একধেৰে ভাত খেতে
 ইচ্ছে হাচ্ছে না মোটেই। এৰুখনি উঠুন ধৰিয়ে কিছু শিঠে কৰে কেলমে।”

ভাৱ কৰা শুনে চাৰী-বো বললে—“না, ৱাতিয়ে শিঠে খাওৱা তোমাৰ হুবে না। ভাত
 তৱকাৰি ৱাঁধা সেই কৰন আমাৰ হৱে গেছে। তুমি বাপু, তাই পেয়ে ভোকা ঘুম লাগাও।
 আমি না হয় ৱাত ৰেগে শিঠে কৰব। শিঠে খাওৱাৰ নথ খেটাবে তুমি সকালে ঘুম খেকে
 উঠে।”

অগত্যা বোৱেৰ কথাৰ ৱাকী হয় ফড়িং। এক খালা ভাত খেয়ে শুৱে পড়ে আৰ ললে
 লকেই ভাৱ নাক ভাকতে শুক কৰে। বো ভখন বসে বাৱ শিঠে তৈৱি কৰতে। ৱাত বেড়ে
 চলেছে, এদিকে ফড়িঙেৰ বো শিঠে তৈৱি কৰছে তো কৰছেই। দৰা উঠুন খেকে নামানো
 একৱাশ টাটকা শিঠেৰ মিঠে পক্ষে ম-য কৰছে বেন সান্নাটা ঘৰ। শুনে ৰেখল চাৰী-বো বাৱো
 ‘হুড়ি’ (‘ফুড়ি’) শিঠে কৰা হৱেছে সবহুহ। বোটা সব ৱকমেই ভালো, কিন্তু বড় নোলা ভাৱ।
 শিঠেৰ ভাঁইৱেৰ কিংক ডাকিয়ে ডাকিয়ে ভাৱ জিব বিয়ে নাল পড়াতে লাগল। লোত সাহল্যতে
 না পেয়ে গণ গণ কৰে সিলতে লাগল শিঠেগুলো। মাহুৱেৰ খাওৱা তো নয়, ৱাহুণীৰ
 পেলা বেন। প্ৰায় সবগুলো সাবাড় কৰে মাজ কহেকটা। ৱাখল বামীৰ ৰঙে একটা খালাৰ
 ঢাকা ঘিৰে। পৱদিন সকালে উঠে শিঠে খাওৱাৰ নথ খেটাবে সে। বিছানাত গিয়ে ঠেলেঠেলে
 ফড়িঙেৰ ঘুম ভাঙালে ভাৱ বো। বললে—“আমাৰ শিঠে তৈৱী শেব হৱেছে। কিন্তু একটা
 বোকাপড়া হওৱা ধৱকাৰ আমাৰেৰ মথো। কথা ৱইল, কাল সকালে যে আগে ৰেগে উঠে
 বিছানা ছাড়বে, সে পাবে শিঠেগুলোৰ মাজ তিনভাগেৰ একভাগ, আৰ পৰে যে উঠবে ভাৱ
 ভাগে পড়বে বাকি সবটা।” লহল মৱল মাহুৰ ফড়িং শুনী মনেই লাৱ বিল বোৱেৰ কথাৰ।

পৱদিন ভোৱ হ’ল। হুবিয়ামা বধা লমৱে উঠিলেন আকাশে। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও চাৰী
 আৰ চাৰী-বো কেউই ওঠে না বিছানা ছেড়ে। ক্ৰমে বেলা দুপুৱেৰ কাছ খেবে এলো। কিন্তু
 দু’খনেই পড়ে ৱইল মটকা খেৰে একেবাৰে নট-নড়ন-চড়ন হৱে। শেবে চাৰীৰ হাঁস হ’ল
 যে, ক্ষেতে বহি সে না বাৱ, তাহলে সাংঘাতিক কতি হৱে বাবে। মনে মনে বললে,
 চুলোৱা বাকগে তিন ভাগেৰ দু’ভাগ শিঠে খাওৱাৰ আৱান, আৰ লকে লকেই বিছানা ছেড়ে
 লাকিয়ে উঠল ভড়াক কৰে। সে ঘৱেৰ ৰৱল খুলতেই চোব কচলাতে কচলাতে বিছানাত
 উঠে বসল ভাৱ বো। বললে—“আগেই যে উঠে পড়লে, কাজেই তিনভাগেৰ একভাগ

মাত্র শিঠে পাবে তুমি।” চানী বললে—“বেশ তাই সহ্য।” কিন্তু নিজের ভাগের শিঠে খেতে গিয়ে চানীর তো চক্ষু ছানাংড়া! দেখল খালার উপর রয়েছে, করেকটি মোটে শিঠে। বোকে ভিজেন করলে—“এই, বাকী শিঠগুলো গেল কোথায়?” তখন বেন আকাশ থেকে পড়ল চানী-বো। বললে—“কি বা-তা বলছ পাগলের মতো। বাকীগুলো আবার কি? বা শিঠে করেছিলাম সবই তো রয়েছে ঐ খালার। নিজের ভাগেরগুলো খেয়ে নিয়ে বাকীটা আমার ভন্তে রেখো বিরো, বুঝলে?” চানীর তখন আকেন গুড়ুন হবার মতো অবস্থা। এত রাত জেগে বো করল কিনা, মোটে এই কয়টা শিঠে। এ হতেই পারে না, অসম্ভব।”

হঠাৎ চোখ পড়ল তার বেড়ার কোলানো শিঠে বানাবার বেতের চোটালো প্রকাণ্ড পাতার ওপর। এমনি কৌশলে ওটা তৈরী যে, বসতুলে। শিঠে বানানো হয় তার সবগুলোর ধাপ লেগে থাকে ভুতে। ওটা এক নম্বরে দেখে নিয়ে গুম হয়ে বসে রইল কড়ি। বো তাকে ছ’একবার কাঁধে বেরোবার ভন্তে তাসিবি দিলে, কিন্তু কথাটি নেই কড়িডের মুখে। তার ভাবগতিক দেখে বো চলে গেল ঘর-সংসারের কার্যক্রম করতে। আর সেই একই জায়গার একইভাবে বসে শিঠের ধাপগুলো গুণল কড়ি। তারপর নিজের ভাগের শিঠে করটা খেয়ে কোনো রকমে শিতি-রক্ষা করে বেরোবার ভোড়জোড় করছে, এমন সময় তার বো আবার এল রোজকার মতো তাকে পান-সুপরি দিতে। হাত পেতে পান-সুপরি নিয়েই একটা ছড়া কাটল কড়ি, ইজিতে বোকে বুঝিয়ে দিলে যে, তাকে ঠকানো অত সহজ নয়। তারপর কতগুলো শিঠে হয়েছিল তার সংখ্যাটা বখন সব বললে, তখন বো তো রীতিমতো জাবাচাকা খেয়ে গেল পোরামীর কাছে ধরা পড়ে বাওয়াতে। লজ্জার একেবারে বেন যরনে যরে গেল চানী-বো। কিন্তু এর ক্যমতা দেখে পর্ববোধও করল সে।

স্কীরের উঠানে বখন নামল বিকেলের ছায়া, তখন নদীতে গেল কড়িডের বো গল আনতে। পাড়ার বৌ-কিরী অনেকই এসে জটলা করেছে নদীর ঘাটে। যেয়ে দললিসে গল্পগাছা জমে উঠেছে বেশ। তার বামী যে একজন মত্তবড় গুনী সে কথাটা বলবার ভন্তে তার মনটা আঁহু-পাঁহু করতে লাগল। কথালাপের দাবখানে একটু কীক শেরেই ছুড়ে দিলে বামীর গুবকীর্ভন। বললে—“সত্যি বলছি তাই, আমাদের ঘরের লোকটি একটি গুনী মাছ। অত লোকে কি ডাবছে, লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছে, সব জানতে পারে সে।”

যের-মল্লিস থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল পুরুষদের মহলে। যেখতে যেখতে সারা গাঁ-ময় ঘটে গেল কড়িডের অসুত ক্যমতার কথা। অনেকেই তা বিশ্বাস করল না। কেউ কেউ ঠাট্টা বিজ্ঞপ করে তার নতুন নামকরণ করলে—“সবজাভা”। এই উপনামের আড়ালে চাপা পড়ে গেল

আদল নাম—গোটা গ্রামখানিতে সবজাত্য মাখেই হ'ল কড়িঙের পরিচিতি। কাকর কাকর মনে কিন্তু এ বিখ্যাত দৃঢ়ত্ব হ'ল যে, কড়িঃ লোকটা বাণবিকই শুণী, গণনা তার একেবারেই নিবুল। ওর ওপর তাহের মনে মন্ত্রাল গভীর জ্ঞানভক্তি। প্রতিবেশী চাষী ঘনরাম ছিল কড়িঙের এমন এক অহরহস্ত ভক্ত। সেদিন দুপুর বেলায় ঘনরাম এসে উপহিত কড়িঙের কুঁড়ে ঘরে। তার একটা কালো গরু নাকি হারিয়ে গেছে। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও গোকটোর কোনো হদিশ পাগনি সে। গোকটা কোথায় আছে তা শুধে বলতেই হবে কড়িঙকে, নইলে নাকি তার ধরজার চৌকাঠ ছেড়ে উঠবে না সে। এখন হয়েছে কি, সেদিন সকাল বেলা কড়িঃ গিয়েছিল কি একটা কাজে ভিন্ গারে। খেয়ালী মাছব কড়িঃ এমন একটা ভুলে সে পথ ধরে গিয়েছিল, যে-পথে মাছব চলাফেরা করে না; অনেকখানি পথ অতিক্রম করে মত্ত বড় একটা জলা। ঘনরামের কালো রঙের এই হলছাড়া গোকটাকে কড়িঃ দেখেছিল এই জলা জায়গাটার, একলা দাঁড়িয়ে ভালো বাস খেতে। এতক্ষণ পর্বত বখন কেরেনি, তাহলে ওটা শুধানেই আটকে আছে ভালো বাসের ধামে। কপাল ভূঁকে ঘনরামকে বলল কড়িঃ শুধানে গিয়ে খোঁজ করতে। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হ'ল লোকটি। জলার ধারে গিয়ে দেখে, কড়িঃ বা বলেছিল তা একেবারে হবহ ঠিক, জলায় মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে গোকটা।

এই ঘটনার অবিস্মারীরা একদম থ হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল কেউ-কেটা নয় কড়িঃ, সব ঘটনাই জানতে পারে সে। দেখতে দেখতে ব্যাতি ওর ছড়িয়ে পড়ল দূরদূরান্তে। তাকে দেখবার ক্ষেত্র রুত লোক আসতে লাগল দূরের গ্রামগুলো থেকে, তেজাঙ্কুরের মাঠ পেরিয়ে। দিন কয়েকের মধ্যেই সবজাত্য নামে সর্বত্র পরিচিত এই শুণীর ববর গিয়ে পৌছল ভিন্ দেশের এক রাজার কানে।

সেই রাজার অন্তর-মহলে একদিন তুলকালাম কাণ্ড। রাজার লাখ টাকা ধানের একটা সোনার হার হারিয়ে গেছে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এই হার পরে রাজা গিয়ে বসেন রাজ-দরবারে। অন্ধ-পুত্রেই সবকিছু রক্ষিত থাকে সেই মহার্ঘ স্বর্ণহার। সেখান থেকে কেমন করে হাওয়া হয়ে গেল সেটা।

খোঁজ খোঁজ খোঁজ। একটা বিষম হইচই পড়ে গেল রাজপুরীতে। আঁতিপাতি করে খোঁজা হ'ল সব জায়গায়, কিন্তু পাক্সা মিলল না হারানো হারের। তখন রাজপুরীতে ভাক পড়ল সবজাত্য কড়িঙের। রাজদুতেরা বখন কড়িঙের কাছে হাজির হয়ে তাকে রাজ্যজা নিবেদন করলে, তখন বাব পড়ল সে বেচারীর মাথায়। একবার ভাবল, রাজার কাছে গিয়ে সরাসরি বলবে যে, কোনো দৈবশক্তি তার নেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তা'হলেও তো রেহাই পাবে না সে। সবাইকে খোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে বলে রাজা তাকে ভালবুজা দিয়ে

খাওয়াবেন। কাজেই রাঙাপুরীতে গিয়েই না হয় আর একবার অম্বকারে ঢিল ছুঁড়ে দেখা যাক, কপালে কি আছে—একথা ভেবে দুর্গানাম স্মরণ করে রওনা হ'ল কড়িঃ রাজ-ধরবারের উদ্দেশ্যে। ধরবারে হামির হলে পর সিংহাসন থেকে উঠে রাজা তাকে স্বাগত জানালেন, আর নিজে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন সিংহাসনের পাশেই একটি খালি আসনে। তারপর অম্বর-মহলে নিয়ে যাওয়া হ'ল কড়িঃকে। কাককার্য করা একটি আসনে খেতে বসল সে। সামনে রাখা হ'ল কচিকর হরেকর কনের খাবার—একবারে খোড়শোপচাঁচ বাকৈ বলে। তার মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড একবাটি ভুতি খন হই।

এখন, রাজার ছিল দুই রাণী—নাম তাদের মা-বই আর হা-বই। এদিকে হয়েছে কি, ছোট-রাণী হা-বই-ই চুরি করেছিল হারটা। যখন শুনল যে, সবজাভাকে তেঁকে পাঠানো হয়েছে চোর ধরবার লক্ষে, শুখন সে পঞ্চল মহা দুর্ভাবনা। পানের ককটিতে একলা চূপ করে বসে নিজের অদৃষ্টে যে কী দুর্গতি আছে তাই ভাবতে লাগল সে। এদিকে কড়িঃের অবস্থাও তথৈবচ। রাজভোগ খেতে বলে ভাবছে সে নিজের দুর্ভোগের কথা। রাজা যখন জানতে পারবেন যে, কড়িঃের লবই কড়িকার শুখন যে তার পর্দানটি ধাবে তাতে তো আর লম্বহ নেই। তবে তার গলা তড়িয়ে কাঠ। এই অবস্থায় বাঁহাতক না পাতের পাশে বইয়ের বাটিটা নজরে পড়া, অমনি গলাটা ভিড়িয়ে নেবার লক্ষে ওটা তুলে নিল কড়িঃ। তারপর স্থান-কাল তুলে গিয়ে উঁচু গলায় আর্দ্রনাথ করে বলে উঠল—“হা বই। এই শেব বারের মতো তোমাকে চেখে নিই। আমল কথা জানতে তো আর বেরি হবে না রাজার। শুখন কী বিচার যে তিনি করবেন সে তো জানাই আছে।”

পানের ককে বসে-থাকা ছোটরাণী হা-বইয়ের কানে গেল হোর গলায় বলা কড়িঃের কথাগুলো। ‘চেখে নিই’ শুনতে ‘খেখে নিই’ শুনল সে। তার অজ্ঞানতা কেঁদে উঠল। ভাবল, ওঘরে যে বসে আছে সে, বৈবচকু বিধে তা দেখতে পেরেছে সবজাভা। আর তার শেব সময় যে বসিয়ে আনছে সে কথাই তাকে জানিয়ে দিল সে। আচ্ছ! তার নাম যে হা-বই সেটা পূর্বজ্ঞ অজানা নয় এই গুণী লোকটির। ভাবতে ভাবতে আর প্রকৃতিস্থ রইল না হা-বই। মান-মর্দাণা লক্ষ্য-পরম হলে গিয়ে, হস্তমস্ত হয়ে দুটে এল সবজাভার পাতের কাছে। তারপর কাহুতি-মিনতি করে বললে, “সবজাভা, ধোঁহাই তোমার, রাজার কাছে সব ফাঁপ করে দিয়ে না, তাহলে রাজা আর আমাকে জ্যান্ত রাখবেন না।” ছোটরাণীর কথা শুনে প্রথমে সব-জাভার তো আত্মলগ্নত্বম্। ব্যাপারখানা কি? কিন্তু অত্যন্ত চালাক লোক সে, প্রেমের পর প্রম করে আনলে ব্যাপারটা কি এবং কতদূর পূর্বস্থ গড়িয়েছে, সবকিছু খোলা আকাশের মতো খোলসা হয়ে গেল তার কাছে। ছোটরাণী হা-বই-ই তাহলে চুরি করেছে হারটা।

তখন খুব ভাবিতিকি চালে বললে—“রাণী মা, কিছু ভাববেন না আপনি। এই হার চুরির গোপন কথাটা খুৎকারেও আমি রাজাকে বলব না। কিন্তু আমার কথা মতো কাজ করতে হবে আপনাকে। রাজা যে বাস্তুটিতে তাঁর নিজের লক্কী কাগজপত্র রাখেন, তার একেবারে নীচে হারটা রেখে দিন। তারপর যা করবার আমি করব।”

সবজাত্যর নির্দেশ মতো কাজ করলে ছোটরাণী।

পূর্বদিন দরবারে গিয়ে সিংহাসনে বসেই ফড়িংকে লক্ষ্য করে রাজা বললেন—“ওহে সবজাত্য, এবার সভাসবের সামনে যেনো তো কে—কে সেই চোর, রাজস্বঃপুত্র থেকে হার চুরি করবার মতো বুকের পাটা যায়!”

রাজাকে মাথা হুটুয়ে অভিধান করে ফড়িং বললে—“আপনার একজন বীন বহিঃ নগণ্য প্রজা হতে পারি আমি, কিন্তু আমার গণনা কখনো ভুল হবার নয়। খুব ভালো করে শুনে আমি দেখলাম যে, আপনার সোনার হার আছে চুরি হয়নি। আপনার গোবার ঘরে হাতীর দাঁতের ছোট বাস্তুটিতে কাগজপত্রের নীচে চাপা পড়ে আছে ওটা। আশ্চর্য! এই বাস্তুটা খুঁজে দেখবার কথা কারুরই মনে হয়নি।”

চটপট কার্টের বাস্তুটা দরবারে আনালেন রাজা। খুঁজে দেখা গেল যে, কাগজপত্রের নীচেই আছে হারটা। রাজ-দরবারে লম্বাপত সকলেই ধস্ত ধস্ত করতে লাগল ফড়িংকে আর রাজা খুশি হয়ে বোষণা করলেন যে, এই সবজাত্যকে যেহেতু তিনি এতদূর জমিজমেরত আর ক্ষেত-খামার। আর সেই দিন থেকেই কাজে লাগিয়ে দিলেন তাকে রাজ সন্ন্যাসরে।

এমনি ভাবে দিন যায়। একদিন রাজার ইচ্ছে হ’ল যে, আর একবার তিনি সবজাত্যর কমতাতা পরীক্ষা করে দেখেন। সেদিন দরবার বসেছে বখাটীতি। সিংহাসনে বসেছেন রাজা, বা হাতটা তাঁর মুঠো করা। ফড়িংকে কাছে আসতে ইচ্ছিত করে রাজা বললেন—“বলো তো যে সবজাত্য, কি আছে আমার হাতের মুঠোর ভেতরে?” শুনে ফড়িং তো চোখে সরবে ভুল দেখতে লাগল। তাবল, আবাব পরীক্ষা! এই পরীক্ষাই বোধ করি হবে শেষ পরীক্ষা। তারপর ওর অভ্যাস মতো মনে মনে ছড়া বেটে বিড়বিড় করে বলতে লাগল—

চালের পিঠে শুণেছিলাম

গণনাতে হয়নি ভুল।

গকটা ছিল তলার ধারে

তাতেও হয়নি ভুল এক-ভুল।

সোনার হারের গোপন কথা

জানতে পারি বৈয়ের দরার,

হারের কড়ি, বেবোরে তোয়

এবার হুঁরি প্রাণটা যায় !

শুক থেকেই ছড়াটা কেমন
হেয়ালির মতো ঠেকছিল রাজার
কাছে। বৈয়ের দরার-টার আবার
কি রে বাবা! কিন্তু শেব শক্তির
জুটো শুনে 'জয় সবজাত্তার গুহ'
বলে চোঁচিয়ে উঠলেন রাজা।
ব ল লে ন—“আচ্ছা! সবজাত্তা,
আমায় হাতের মূঠার ম ধো
বে কড়িটা রয়েছে এবং চাপে পড়ে
সেটার বে মর মর অবস্থা, তা কি
করে জানলে তুমি!” তুমি মাহুদ
না যেবত? কিন্তু সবজাত্তার নাম
বে কড়ি এবং সে যে নিজের পরিণামের কথা শুনেই ছড়া কেটে বিলাপ করছিল, তা তো
আর জানতেম না তিনি।

তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল দরবার-গৃহে। আনন্দ-কলরব একই থামলে পরে, হাতের মূঠা
খুলে কড়িটাকে ছেড়ে দিলেন রাজা। করকর করে উড়ে চলল ওটা গণরের দিকে। শেহিক
পানে তাকিয়ে মনের খুশিতে মাহুদ কড়িরেরও ইচ্ছে হচ্ছিল তিড়ি-তিড়ি করে লাফাতে।
কিন্তু অতি কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে।

আমশে আত্মহারা রাজা শুধন করলেন কি—নিজের সোনার কাছ-করা কোঁর্তাটি পরিবে
দিলেন কড়িরের পায়ে। ধস্ত, ধস্ত, রবে মুখরিত হবে উঠল দরবার-গৃহ।



‘বলো তো হে সবজাত্তা, কি আঁতে আমার হাতের মূঠার
কেবরে!’—পৃষ্ঠা ৭০

সম্মুখ সমরে

শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য

না, পারল না! তবু হেথিয়ে, প্রলোভন হেথিয়ে, গ্রেব-আবরের কথা হ'লে, পারে মাথায হাত বুলিয়ে একটি কথাও বার করতে সমর্থ হ'ল না! মরে গেল—তবু নানটুকু পূর্বস্ব বলানো গেল না! সাগাটা বেহ বুলেটে বুলেটে কাঁকরা হয়ে গেছে, তবু একটু কাঁকরতা নেই! একটা কথা মাত্র বলেছে—'লেট মি ভাই পিস্ফুলি' (আমাকে শান্তিতে মরতে দাও)। গ্রান উৎসর্গ করে বিল—কিন্তু নাম জারির করার শেব হুগোপট্টুকোও নিজেই সমাহিত করতে চাইল! সকলের অপোচরেই অজ্ঞাতে এই আত্ম-বলিধান! সাবাস ছেলে! সাবাস তার বাংলা মা—বে মাটিতে সে কৃষি হয়েছ!

বৈদেশিক শাসক ও শোষকের শৃঙ্খল মুক্ত করতে আপোবহীন লড়াই ছাড়া শত্রাবীন জাতের অপর কোনও অস্তিত্ব বা জিরাকলাপ থাকে না। সেই লড়াইয়ের বীরেরাই সমকালীন ইতিহাসের রচয়িতা। ভারতের বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বিশোর-দুবারা আত্মহত্যার মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসের শতাব্দীর অন্ধর এক-একটি অহুজ্জ্বলের মাল-মসলা রেখে গেছেন। ইতিহাসের এমনই একজন নায়ক—নলিনী বাগচী। অজ্ঞাত থেকেই বে আত্মদান সে করে গেছে, ইতিহাসকাররা এতাবং তার পরিচয় না নিলেও, তরুণ সমাজের কাছে সে থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণনায়ে তখন বিশ্ব প্রকম্পিত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুণর বিদ্রবীরা হানা দিয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে। বিদ্রবী আন্দোলন দমনে পুলিশ, মিলিটারী, গুলচর বিভাগ—সবাই তৎপর। ঢাকা সে সময় বিদ্রবীদের একটা বড় ঘাঁটি। ঢাকার থেকে বাবীনতার মুক্ত চালিয়ে বাওরা বিদ্রবীদের পক্ষে অলম্বব হয়ে পড়ল।

কিন্তু তা বলে তো মুক্তি-সংগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না! নতুন ঘাঁটি করতে হবে। আসামে তখনও কোন কেন্দ্র হয়নি—কাজেই তৎপরতাও ওখানে পুলিশের কম। ওখানে নিরপত্তা আশাতত: আশা করা যায়। তারপর ওখানে সংগঠন গড়ে তোলারও তাগিদ রয়েছে। তাই পোহাসির পথে সাক্ষি জমালেন বাংলার তরুণ বিদ্রবীরা। নলিনী বাগচী, সতীশ শাক্তাশি প্রমুখ গিয়ে কেন্দ্র স্থাপন করে ফেললেন। হাতিয়ার সঙ্গেই ছিল এবং আরও যোগাড় হতে লাগল। মোটামুটিভাবে পুরোদমে কাজ এগিয়ে বাজিল।

বিদ্রবী এই তরুণরা আস্তানা গাড়লেন ছুটো বাড়ীতে। বাংলার পুলিশের কাছ থেকে ধবর পেয়ে আসাম পুলিশ এধের শক্তির সঙ্গে কড়া মজরের ব্যবস্থা করে ফেলল। হরিস তারা পেয়ে গেল। বড়দিনের দরজমে বেশ-বিবেশী সাহেবহুগোরা সব হৈ-হলোড়ে যেতেছে!

হাকপ শাঁত! তারই মধ্যে
এক নিমিষে রাতে বহু
রাইফেলধারী মার্চ করে পথে
চলল। তাদের—আগে গাড়ী
বোঝাই অফিসার ও ব্রিগেড-
ডায়েরী গেলেন। তারা
বাড়ী দুটোকে ঘিরে ফেলল।
পুলিশ ভাবছে—এ বা রে
বাছাধনরা যাবে কোথা? কিন্তু
ভেতরে ঢুকে দেখে বাড়ী
কাঁকা। কেউ কোথাও
নেই। ছেলেরা পুলিশ এসে
ঘেরাও করার আগেই সরে
পড়েছে। এই নাকের ওপর
ভুড়িতে বড় বড় কতারা বে
বোঁতা মুখ উঁচিয়ে এগেছিল
তা ভোঁতা হয়ে গেল।

এই ব্যর্থতার পুলিশ
খাপা কুহুরের মত চারদিকে
ছোটাছুটি শুরু করে দিলে।
সেই রাতেই ওদের বার
করতে হবে। পুলিশ হল এক
পাহাড়ের টিলার কাছে যেতে
এক ক'ক গুলি এদের উপর
এসে পড়ল। পালটা আক্রমণের মত মদোবল তখন আর পুলিশের নেই। চাঁচা আগুন গ্রাণ বীচা,
ভেবে যে ঘেরিকে পায়ল নৌকে পালান তারা।

পুলিশের বড় অফিসাররা আবার বকে-বকে লবাইকে এক করে আরও রাইফেল, আরও
গুলি ঘিরে পাহাড়ের দিকে পাঠানেন। এই বিরাট বাহিনী পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলল।
পাহাড়ের ওপর সাতটি তরুণ। তাদের হাতে হুশারার কোনও আরোহণ নেই—কিন্তু মনে



‘তানলার ভেতর থেকে মিলিনীর শিশুরা অগ্নিবর্ষন শুরু করল।’—পূর্বা ৭১

তাদের দু'জনের সাহস আর অটুট অবস্থা সংকল্প! শিশুর মতল করে এবং অল্প পরিমাণ তুলি বাকর নিয়েই তারা ঐ বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে চলল। আত্ম-সমর্পণের কোনও বাসনা তাদের নেই! কিন্তু এক সময় গোলাবাকর ছুরিয়ে গেল! নিতান্ত মৃত্যুর সাহসে অটল হয়ে তারা ঠাঁড়িয়ে রইল পাঁচজন। দু'জন পেছন থেকে সরে গেছে। পুলিশের চোখে খুলো নিয়ে মলিনী বাগচী ও সতীশ পাণ্ডাশি আবার উধাও হয়েছে। মহাভীক্কেম আন্তে আন্তে পুলিশ সতীন উঁচিয়ে এসে পাঁচটি তরুণকে আহত অবস্থার গ্রেপ্তার করল। তাদের তখন প্রচণ্ড উদ্ভ্রাণ! বিজয়ের পৌরবে তারা মশগুল!

মলিনী ও সতীশ পাণ্ডাশি পুলিশের হাতে না পড়লেও বড় অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ল। পকেটে একটি আধলাও নেই। তার ওপর রেলের চড়লে পুলিশের চোখে পড়ার আশঙ্কা! কিন্তু সব প্রতিবন্ধতা ভর করার দক্ষতা নিয়ে এরা এই কটক-পথে বেরনো। কিছু না থাকলেও পা-তোড়া তোরয়েছে! হাঁটা-পথে কলকাতা ছুটলো দুই তরুণ। পাণ্ডা, মল, নদী সব অতিক্রম করে এসে পৌছল এরা পহর কলকাতার।

কিছু তখন কলকাতা ছাড়ি-ছাড়ি করছে। কেক্সারী যান। মহানগরের ঠাঁকা মাঠে একটা ছেলেকে হুকড়ে পড়ে থাকতে দেখেছে সবাই—কিন্তু কাছে কেউ যায় না। বাবে কি—ছেলেটার গায়ে খেরিয়েছে গুটি বসন্ত। ছেলেটা বেথোরে পড়ে আছে—জান নেই। বহু লোকই দেখে—একটি তরুণ ব্যাবার তার দিকে দেখেছে। শেষ অবধি মুখের ঢাকা সরিয়ে ভালভাবে দেখল। হ্যা—এ তো তাদেরই মলিনী! মলিনী এইভাবে মরতে বসেছে! ছেলেটি তাদেরই দলের। সে মলিনীকে এনে নিজের বাড়ীতে তুললো। বহু দেবা-ওজ্বার কিছু হুখ করে আনলো! সবাই মলিনীকে বোঝালো যে, এই হারুণ রোগভোগের পর এখন কিছুদিন বিশ্রাম করুক। কিন্তু কে-কার কথার কান ধের! পরের দেবার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটানো মলিনীর কাছে শান্তিভোগের সামিল।

একদিন ভোরে উঠে সবাই দেখে মলিনী নেই! মলিনী ছুটেছে তখন ঢাকার দিকে। লতা ব্যাকরের এক বাড়ীতে মলিনীর নতুন ডেরা হ'ল। এবার আর সতীশ পাণ্ডাশি সাথে নেই। সে আগেই ধরা পড়ে গেছে।

মলিনীর এবারের ডেরাও পুলিশ গেনে ফেলল। মলিনীর গবে রয়েছে তখন ডাক্তারী মহুমহার। রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্ধরালে বিরাট এক বাহিনী এদের ঘিরে ফেলল। পুলিশের হাতে পড়ার চেয়ে মৃত্যুই ভাল! পালাবার কোনও পথ এবার নেই। কান্নেই ভোরের আলো ফোটার আগেই শিশুর হাতে দরজা খুলেই এরা ক'পিগিরে পড়ল পুলিশ বাহিনীর ওপর। মলিনী তখনও অস্বস্থ! তাই সে তারিণীর পেছনে। এদের শিশুর গলে

উঠল। এক হাবিলদার বুক চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুলিশ তখন মরিয়া। দ্রুতি ছেলের ওপর মুহূর্তঃ গুলি ছুটেছে রাইফেল-রিডলতার থেকে! তারিণীর পেটে আর বুক বুলেট লাগল। সে পড়ে গেল। নলিনীও অকৃত নেই। এবার দে এক! নলিনী ছুটে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। জানলার ভেতরে থেকে নলিনীর পিণ্ডল অবিবর্ণন হুক করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এক গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর। পুলিশ তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছাড়ছে। নাঃ! নলিনী আর জানলার নেই। পুলিশ দরজা ভেদে ঘরে ঢুকে দেখে নলিনী পড়ে আছে। হাতে তার পিণ্ডল ধরা রয়েছে—কিন্তু কব্জি ভেদ করে একটা বুলেট চলে যাওয়ার হাত নাকার ক্ষমতা আর নেই। নলিনীর সারা দেহে বুলেট বিশেষে বেষ্টা ঝাঁকরা করে দিয়েছে। পুলিশ বুল বেষ্টে অস্ত্রক্ষমত পরিকট! তাই তখন পরিচয় নেবার ভেত্রে কত ব্যাভুলতা! যদি কোনও কথা বার করতে পারে!

নলিনীরা ইতিহাসের পাতার বৃক্কের ডালারক্কের চাপ রেখে গেছে। দেই যুক্ত দব কলক্কমর অধ্যায় ধুয়ে তাবের কাহিনী লেখা হবে রক্তাক্করে। নলিনীরা চিরস্মরণীয়, চিরস্মরণীয়!

হাতে হাতে আরাধন

ঐশ্বর্য্যম চক্রবর্তী

‘ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! হেঁচকি উঠচে যা এন্টার!’
এই না বলে হর্ষবর্ধন দেই না কাছে গেলেন তাঁর,
বাঁ করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন তার বাঁ গালে
সহর্ষে ঐহর্ষকেই যেই পেরেছেন নাগালে!
‘হাতে হাতে পেলেন তো ফল, দেখুন, কেমন দাবাইটার?’
এমনি করেই একটি চড়েই হেঁচকি সারাই সবাইকার?
মোটাই হাতের এক চাপটে তারই চোটে যে আক্কার
সারাই ব’লে, সবাই বলে রামহাতুড়ে এ ডাক্তার!
হাতুড়ে গোবন্দি ব’লে যা খুশি সব ঘোঁটি পাকায়,
তবু সবাই সেরে তো যায় এক চাপড়ে এটোটিকায়!
যা ব’লে লোক হয় খুশি হোক, আমার তাতে ডোন্কেয়ার!
হাতে হাতে আরাধন দিয়ে হাতের আরাধন এমনটা আর
মিলবে কিসে?—সেরে গেলেন।—

মুখ যে দেখি গোমড়া তার?’

“আমার কি ছাই হেঁচকি মশাই?”

উঠচে যে ভাই গোবরাটার!!”

বিশ্বশ্রম

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

তোমরা অনেকেই হয়তো ভারত বিখ্যাত ডঃ বিশ্বশ্রমের নাম শুনে থাকবে। এখানে সেই মহান ভারত-সন্তানের কথাই বলব তোমাদের।

১৮৮১ সনের ১৫-ই সেপ্টেম্বর বিশ্বশ্রমের মৈত্রী সন্মেলন অনুষ্ঠান করে। তাঁর মা-বাবা ছিলেন মোক্ষগুণ্ডম গ্রামের লোক। তাই তাঁর পুরো নাম হ'ল মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বশ্রমের।

সাত সাত বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর বাবা মারা গেলেন। এতে তাঁর মা আঘাত পেলেন খুব, কিন্তু তবুও ছেলের সুখচেষ্টায় তিনি সমস্ত ব্যথাই রইলেন ভুলে। ছেলেকে মানুষ করতে হবে এই ছিল মায়ের পন। তাঁর সেই সাহস আর দৃঢ়সংকল্পের জন্যই তিনি ছেলেকে ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

মা ছেলেকে দিলেন গ্রামের পাঠশালার পাঠিয়ে। সেখানে খুব অল্পদিনেই ছেলের নাম ছড়িয়ে পড়ল। পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ আর মেধা দেখে মাস্টার মশাইরাও খুব অবাক হলেন।

ছেলের পরীক্ষা পাশ করে এবার তিনি গেলেন বাকুলোর সেন্ট্রাল কলেজে পড়তে। এখানেও অধ্যাপকরা তাঁর আগ্রহ ও ইচ্ছা দেখে খুব আনন্দিত হলেন। অবশ্য কলেজে পড়ার সময় যদিও তিনি কৃতি পেটেন, তবুও পড়ার পুরো খরচ চালাতে তাকে অনেক সময়-ই 'টিউলানী' করতে হ'ত।

বাহ্যিক কলেজের পড়া শেষ হলে তাঁর তীব্র ইচ্ছা হ'ল ইঞ্জিনিয়ার হবার। কিন্তু সে পড়ার খরচ চালাতে যে অনেক টাকা লাগবে। পরে অবশ্য অধ্যাপকদের সহায়তা ও উৎসাহে তিনি গেলেন পুণাতে পড়তে।

এই ক'বছর তিনি খুব পরিচয় করলেন, তাই পরীক্ষার কাজ বেশি হলে বেশা খেল তিনি বাঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রথম' হয়েছেন। তাঁর মনের ইচ্ছা এভাবেই পূর্ণ হ'ল সার্থকতার সঙ্গে।

পাশ করে বেশি হবার পরই তিনি সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের একটা চাকরীও পেয়ে গেলেন। এই চাকরীতে থাকার সময়ও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফলে ক'বছর পরই তিনি হন সুপারিনটেন্ডিট ইঞ্জিনিয়ার। এই সময় তিনি সিদ্ধনীর উপর বারান্দা বিখ্যাত 'স্বকৃত্ত বাঁধ'।

এই বাঁধ বেধে বেশ-বিবেশের বড় বড় ইঞ্জিনীয়াররাও তাঁর কতিপয়ে বীকার করে নিলেন। সকলে বুঝতে পারল যে ভারতের তরুণরাও বুদ্ধি, ধোঁয়াস্তা আর শত্রুসম্মেলন ব্যাপারে কারো থেকেই কম নয়।

এভাবে চমকিত বহুর বোঝে সরকারের মনোনে কাজ করার পর তিনি চাকরী দিলেন ছেড়ে। আর এবার তিনি স্বাভাৱ্য করলেন বিবেশে নতুন কিছু দেখতে আর শিখতে।

বেশে ফিরে তিনি হারমরাবাধে কাজ করতে লাগলেন। সেই সময় হারমরাবাধে বস্তার প্রচণ্ড প্রকোপ ছিল। যাহূব আর চানবালের কত যে ক্ষতি হ'ত প্রতিবছর তার আর ঠিক-ঠিকানাই নেই। বিশ্ববৈরাগ্য রাত্তির জারগার জারগার বাঁধ বানাবার ব্যবস্থা করলেন।

এর কলে কয়েক বছরের মধ্যেই রাত্তির বস্তা সমস্যা পেল দূর হয়ে। আর বস্তার ফলে নদীর বে জল নষ্ট হয়ে যেত এবার সেই জল-ই চাঁদের কাছ লাগিয়ে বেশের সব জারগার কলান হতে লাগল প্রচুর ফল। বেশের চেহারাই পেল বদলে।

হুযোগ্য ইঞ্জিনীয়ারকে এবার মৈসুরের মহারাজা ডেকে পাঠালেন। রাত্তির সর্বপ্রধান ইঞ্জিনীয়ারের পদ দিলেন তাঁকে। আর কিছুদিন পরে সেই সঙ্গে রাত্তির 'বেওয়ার্ন'-ও করে দিলেন।

রাত্তির উন্নতির জন্য বিশ্ববৈরাগ্য শিক্ষা, কৃষি এবং কল-কারখানা তৈরীর ব্যাপারে মন দিলেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন, তত্রাবতী শহরে ইস্পাত কারখানা বানালেন আর শেষে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচ ব্যবহার উন্নতির জন্য কাবেরী নদীর উপর বানালেন 'ককরাজ সাগর বাঁধ'।

এই বাঁধ বেধে পাক্ষীরা মুক্ত হয়ে বসেছিলেন, 'পৃথিবীতে এই ধরনের বাঁধ আর দ্বিতীয়টি নেই। কেবলমাত্র এই বাঁধ-ই বিশ্ববৈরাগ্যকে আদর করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।'

সৌম্যব্রহ্মী বিশ্ববৈরাগ্য মৈসুরের পৃথিবী বিখ্যাত 'কুম্ভাবন গার্ডেনস্' তৈরী করেন। বেশ-বিবেশের হাজার লোক প্রতিবছর এই গার্ডেনস্ দেখতে যান।

যখন আমদের বেশে স্বাধীন হ'ল তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর বছর, কিন্তু তবুও তিনি যুবকের উৎসাহ নিয়ে নতুন ভারত গড়বার কাজে এসিয়ে এসেছিলেন।

বেশের উন্নতির জন্য তিনি মানাকার করে গিরোছন। বেশ-সেবার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫৫ সালে তাঁকে 'ডায়-ত-রত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯৩১ সালে তাঁর শতবর্ষপূর্তি সম্বন্ধে বেশ জুড়ে শালন করা হয়েছিল, সেই সময়ে তাঁর সম্মানে এক বিশেষ ডাকটিকিটও প্রচার করা হয়।

কিন্তু এতসব সম্মান পেলেও তিনি ছিলেন সহজ, সহল মাহুয; কোনও রকম অহংকার বা অভিমান তাঁর ছিল না।

দেশের এই মহান্ সম্মান ১৯৩২ সালের ১৪-ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

যদিও তিনি আবারের মধ্যে নেই, তবুও তাঁর মতো কর্মযোগী পুরুষ দবাইকে চিরদিন স্মরণে রাখা যোগ্যে।

পিঁপড়াদের গুণ

শ্রীঅমিলকুমার মুখোপাধ্যায়

পিঁপড়েরা পেয়েছে টের

মাটিতে পড়েছে ডের

চিনি সাদা সাদা,

দূরে দূরে থবর যায়,

পিঁপড়েরা সদলে যায়

নিতে গাদা গাদা।

ঠিক একটু একটু করে

নিরে যায় বৈর্য ধরে

নিজেদের ষাঁটিতে,

পরে শুধু দেখা যায়

চিনি নেই একটুও হায়

সেধানকার মাটিতে।

পিঁপড়দের সারি চলে

ঐখানে দলে দলে,

সব চিনির দক্ষা সারা,

চিনি দানা মুখে নিরে

কেমন যায় সারি দিয়ে—

সংখ্যার অগুন্তি তারা।

ঐক রোমান বা শক হুন

আহো অনেকের এই গুণ

কি বে হয়েছিল মাধার

করেছিল আহরণ

ভারা ধরণীর ধন

পিঁপড়ের মতনই বে হায়।



কবি-সাহিত্যিক

নরেন্দ্র

দেব

শ্রীঅভিকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়

*
* *

বরেন্দ্র দেব

নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুতে আমরা একজন বরদী মরদী শিশু-সাহিত্যিককে হারালুম। আমরা যখন খুব ছোট, স্থলে পড়ি, তখন থেকেই 'মোটাক', 'শিশুদাবী', 'নাট্যশালা', 'সন্দেশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিশু-সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। আমার মামা শংকরমুখার্জি ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির', 'নব-নাট্যমন্দির', 'জীৱনম' প্রভৃতি বিয়েটারের প্রধান কর্মকর্তা। আমার বাবা জীৱনীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন নাট্যাচার্য। বাবার সঙ্গে যখন কলকাতায় আসতাম, তখন তাঁর সঙ্গে নাট্যমন্দিরে যেতাম। শিশিরকুমারের ঘরে একটি সাহিত্য-চক্র প্রায়ই বসত এবং বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ, সমালোচক ও বিমর্শন সকলে যোগদান করতেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ আত্মা, প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শরৎচন্দ্র, অমূল্য বিভাভূষণ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি যোগদান করতেন। এইখানে আমি নরেন্দ্র দেবকে প্রথম দেখি।

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে তিনি সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন এবং নিয়মিত লিখতেন। তখন থেকেই তাঁর লেখা আমরা নিয়মিত পড়েছি। ভারতবর্ষ বীৰ বঙ্গের পথে যখন কলকাতায় এলে সাহিত্য-জীবন আরম্ভ করি, তখন শ্রীরত্নের মাধ্যমে আমার দৌলতে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়। এবং আমার সংস্পর্কে আমি তাঁকে বরাবরই মামা বলতাম। বন্ধুর রূপটিং সেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যখন 'বঙ্গপ্রী' পত্রিকার অন্ততম সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের বাসায় গিয়েছি। মুঠ হয়েছি 'ভালবাসা' বেধে। 'In', 'out' শব্দ দুটি বাংলায় 'বাহির', 'ভিতর', লেখা বেধে অবাক হয়েছি। রূপটিং সেনের সঙ্গে আমার বেধে

ବଲେছেন—“ଆରେ, ସନଥକୂମାରের ডାରେ ଦେ, ଏମ, ଏମ।” ବ’লে ଦୋତଳାର ବୈঠକଧାନୀର
 ବসିଥିଲେ। ଶାଧାରାଣୀ ଦେବୀକେ ବଲେছেন—“ଏ ଆମାଦେର ସନତେର ଡାରେ, ମାହିତ୍ୟ କରେ, ତୋମାର
 ସଂକୋଚେର କୋନ କାରଣ ନେই।”

କର୍ମଓହାସିନ୍ ଟ୍ରାଫିଟ (ଏକନ ବିଧାନ ସରଣୀ) କତ ସମୟ ‘ମାର୍ଟିନାଲା’ ଅକ୍ସିଫେ ମେହି ଏବଂ ଉପକ୍ରମ,
 ଆମି ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏକସଙ୍ଗେ ମମ୍ମ କରନ୍ତେ କରନ୍ତେ ଚଲେଛି। ଡାର ମାମା ମାଳାବି, ମାମା କେତୁଲେର
 କୁଡ଼େ। ଏବଂ ହାତେ ବାମ ଏହି ଛବିଟି ବନ୍ଧାବନ୍ଧ ଦେଖେଛି। ଆମାକେ ଦେଖେଲେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ବଲେছেন—
 “ହେଲେଦେର ଜନ୍ମ ଲିଖନ୍ତେ ଚୋଟା କର। ଡାଲ ଡାଲ ଛୋଟା ହିଂରେଜୀ ମମ୍ମ ଥେକେ ଅଭୁବାନ କରବେ ଏବଂ
 ବାର ବାର rewrite କରବେ। ଡାତେ ହାତ ମାକବେ। ଛାମ୍ପବାର ଜନ୍ମ ଡାହାଣଠା କରେ। ନା।”

ଏକଦିନ ଶ୍ରୀରାଜ୍ୟେ ଦେଖା। ଶିମିରକୂମାରେର ଦୋତଳାର ଘରେ। ଆମାକେ ଦେଖେ ବଲେ ଉଠିଲେନ—
 “ଜନମ୍ମ, ତୁମି ମାକି ‘ରମ୍ପକେ’ କାଜ ନିୟେଛ। ବେଶ ବେଶ। ଡାରମ୍ମର ଲେଖା ଚଲେଛ କେମନ?”

ଏକଦିନ ଡାର ବାଢ଼ୀ ମିରେଛିଲାମ, ମମ୍ମେ ହିଲେନ ଶ୍ରୀହାଂତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ଆମାକେ ବଲେନ—“ସ୍ବପ୍ନ
 ବାଛି। ମିରେ ‘ସ୍ବପ୍ନ-ବାହିରେ’ର, ମାଟାରମ୍ମ ବିନ୍ତେ ହବେ। ଶିମିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିରେଛେ।” ବଲ୍ଲମ, “ଆମି
 ଜନେଛି କାନାହି ବନ୍ଧୁ ମାଟାରମ୍ମ ମିରେଛେନ। ବଲେନ ନା, ଶିମିର ଆମାକେ ଡାର ମିରେଛେ ଏବଂ ମାଟାର
 ମକ୍ଷ କରବେ ବଲେ ତାମାମା ବିନ୍ତେ।”

ସ୍ବପ୍ନରୁ ଥେକେ କିରେ ଏଲେ ଶ୍ରୀରାଜ୍ୟେ ଏକଦିନ ଡାର ମାଟାରମ୍ମ ଦେଓରାରି ବିଛୁ ଅଂଶ ମଢ଼େ
 ମୋନାଲେନ। ଡାରମ୍ମର କତ ବେ ଅସଂଖ୍ୟ ମଢ଼ାତେ ଡାର ମଢ଼େ ଦେଖା ହରେଛେ, ଆଳାମ୍ମ ହରେଛେ, ଡାର
 ଆର ହିମାବ ନେଇ। ମେବେର ଦିକେ ବନ୍ଧନ ଇଉରୋପ୍ ଧୁରେ ଆଲେନ, ତବନ ‘ମଢ଼ମ୍ମାର ଗୋଡ଼େ’ ଦେଖା।
 ଟିକ୍ମାତେ କରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ ଶାଧାରାଣୀ ଦେବୀ ଚଲେଛେନ। ଦେଖା ହେତେଇ ବଲ୍ଲମ, “ନରେନ ମାମା କବେ
 କିଲେନ? କେମନ ଆଛେନ?”

ବଲେନ—“ଏକେକ ଦିନ କିଲେଛି ଡାଲ ଆଛି। ଡାକ ଡ଼ାଢ଼ାଚାରେର କାଛେ ବାଛି। ତା ତୁମି
 ଏଥାନେ କେନ?”

ବଲ୍ଲମ—“ମାମେନ ମଢ଼ମ୍ମାରେ “ମଢ଼ମ୍ମା-ମେଟ ଷ୍ଟୋରେ” (ରେନେର ଘୋକାମେ) ସାମେକାରେର
 କାଜ ନିୟେଛି।”

ଅବାକ୍ ହରେ ବଲେନ—“ବାବା! ଏକେବାରେ ମାହିତ୍ୟ ଥେକେ ବାଉବେ ଚାଲ, ଆଟା, ଚିନି!” ଛାଞ୍ଚିତ
 ହରେ ବଲେନ—“କାଜଟା ଡାଲ ହ’ଲ ନା। ମାହିତ୍ୟ ନିରେଇ ତୋମାର ଥାକା ଉଠିତ ହିଲ। ତୁମି ତୋ
 ଅଧିଲେର କି କାମେଲେ ହିଲେ,—‘ଶିମାଳୀ’, ‘ମାମା’ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିତେ ଓ ତୋ ବୁକ୍ତ ହିଲେ। ହାଢ଼ଲେ କେନ?”

ଡାକେ ବଢ଼ି କାତର ଦେଖାମା। ଏକଜନ ଡ଼ମ୍ମ ମାହିତ୍ୟିକ ମାହିତ୍ୟା ହେଢ଼େ ରେନେର
 ଘୋକାମେ ଡାକିରି ନିୟେଛେ। ମନଟା ତାହି ଡାର ବାମାମ୍ମ ହ’ଲ ଆମାର କଥା ଜନେ। କାମିତେ
 ଆମାଦେର ମାତାବନ୍ଧୁମାର ବାଢ଼ୀତେ ଏକଟି ମାହିତ୍ୟା ବୈଠକେ ମାଟାଚାବ ଶିମିରକୂମାର ବଲେଛିଲେନ—
 “ନରେନ ଆମାଦେର ୩୦ ବର୍ଷରେର ବନ୍ଧୁ। ଓ କବି, ତବେ ଏବଂ ମମ୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିତେ ଓ ଗ୍ରହ ହାତ ମାକା।
 ନରେନେର ଜୀ ଶାଧାରାଣୀ ଦେବୀହି ବ୍ୟାପ୍ କବି ଓ ବିଛୁବୀ ସାହିତ୍ୟ।”

ଏହି ମାହିତ୍ୟିକ ଓ ବୃଦ୍ଧ କବିର ସ୍ବଭାବେ ଆତ୍ମୀୟ-ବିରୋଧେର ସାଧା ଅଭୁତବ କରାଛି। ଡାର
 ଅଭୁତେରା ବରାବରେର ଜନ୍ମ ଆମାର ଜୀବନେର ମାଧ୍ୟମ ହରେ ଥାକବେ।



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

[ৗই]

এই ঘটনার পর কয়েকমাস বেটে গেছে—

যত দিন যাচ্ছে—সাতকন্নার কলহাস্তে বাড়ীটা খেন অণে অণে ঘূষিত হয়ে উঠছে—

এক-একটা দিন যাচ্ছে—অ'র বোনেদের ভিজালা—আজ আশলা কতটুকু বাড়ল ঠানপিসী !

ওদের আগ্রহ দেখে ঠানপিসী কোন্সলা দীতে ফিক্ ফিক্ করে হাসে। অব্যব দেহ—
ব্যাঙের আখুঁতি তো তাই আস্তে আস্তে বাড়ে। হঠাৎ একদিন দেখবি—একেবারে ইয়াবড়া
খোয়ান হয়ে গেছে—

বোনেদের কৌতূহলের সীমা নেই।

তাই ভিজালা করে, আচ্ছা ও ভীম হবে—না—হারকিউলিস্ হবে ?

ঠানপিসী উত্তর দেহ—শোন বলি তোদের। 'ও ভীমও হবে না—গোবর-গামাও হবে
না। 'ও একেবারে নতুন আশলার মতো চক্চক্ করবে'। সবাই ভাববে—খাঁটি গিনি হবে
বুঝি।

একদিন হঠাৎ বোনেদের সোলাস ধনি শোনা গেল—ঠানপিসী--দেখবে এসো—দেখবে
এসো—

ঠানপিসী আনন্দে আর বিরক্তিতে উবেল হয়ে ওঠেন,—তোদের আবার কি আমি হুঁপত ঠাকুর-সেবতার নামও করতে পারবো না ? কি দেখবে কি শুনি ?

বোনের দল কল্কলিয়ে ওঠে ।

—দেখবে এসো এইমাত্র আঁধার নিজে নিজে উপুড় হ'ল । ঠানপিসী এগিয়ে এলেন মজা দেখতে ।

তারপর কইলেন, এখনই হয়েছে কি ? এরপর হামা দেবে,—কখনো খাট থেকে নীচে পড়ে যাবে,—তারপর এক-পা, দু-পা করে হাঁটতে শিখবে । যত বত জিনিসপত্তর থাকবে সব তখন চু করে কেলবে । আবার আনাশা গলিয়ে কত জিনিস সাধু-সন্ন্যাসী ও তিথিবীদেব দিয়ে দেবে । জোয়া বীরেশ্বর বিলের বাল্যকালের কথা—সেদিন পড়িস নি ? ওই আঁধারও সেই সব কাণ্ড করবে । দেখে নিস্ তোরা, আমার কথা অন্তরে অন্তরে কলে কিনা ?

বোনেরা হুশী হয়ে ভিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ঠানপিসী, তকে একটু চকোলেট খাইয়ে দেবো ? তাহলে মনে খুব জুতি পাবে !

ঠানপিসী শিউরে উঠে বলেন, এমন সর্বনেশে কথা বলিস নি তোরা ।

—কেন ? কেন ? সর্বনাশ কিসের ?

স্বধোয় বোনের দল ।

ঠানপিসী চোখে-মুখে তখন কৌতুক-কথা নেচে বেড়াতে থাকে ।

—শোন বলি তবে । আগে ছয় মাসের হোক,—অগ্রপ্রাণের বাবুয়া করি,—নতুন নামকরণ করা হবে ওর । তখন পুরোহিত ঠাকুর ওর মুখে প্রসাদী পরমায় তুলে দেবেন । তার আগে দুধ ছাড়া ওর মুখে আর কিছু তুলে দেয়া চলবে না ।

বোনের দল প্রমত্ত করে, এত সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে ?

—তা মানতে হবে বইকি ! একটু ঢেলেকে মাসুখ করা কি সোজা কথা ? টবে ফুল জুটিয়েছিস তো ? একটা ফুল ফোটার পর কত হাদিসা ভেবে দেখ তো । প্রথমে কুঁড়কুঁড় করে মাটি তৈরী করে, তাতে নানা রকম সার মিশিয়ে দাও । ফুলের বীচি—কিংবা গাছের চারা পুঁতে দাও সেই মাটিতে । প্রয়োজন হতো জল চিটিয়ে দাও তাতে । এমন আরগার টবাটিকে বসিয়ে রাখো যাতে সূর্যের আলো পায়—কিন্তু সব সময় চড়া হোদ না লাগে । আলো-ছায়ায় খেলিয়ে সূর্যের ভাবে বাড়তে দিতে হবে ওই ছোট চারা গাছটিকে । সব সময় নরম রাখতে হবে—যাতে চড়ুই কিংবা অন্য কোনো পাখী এসে গাছের সস্ক নরম পাভাগুলি ঠুক্বে খেয়ে না ফেলে । তারপর দিনরাত্তির চোখ রাখতে হবে—সেই ছোট কচি চারা গাছটির ওপর । যদি টবে আশেপাশে কাটা গাছ গাছিরে ওঠে—তাহলে আনত্যা করে সেগুলো

তুণে ফেলতে হবে। বেশী দৃষ্টিতে নয়, বেশী হোদে নয়, — বেশী তখনো খটখটে কাহনায় নয়। তারপর একদিন দেখবে—একটি ছোট্ট কুঁড়ি উকি দিয়েছে—স্বাধীন হাওয়ায় ফুলছে।

সাত বোন বেশী হালিয়ে—চোখগুলো বড় বড় করে হাত মুখ নেড়ে বসে, বাঁকা! এ যে একেবারে সপ্তকান্ত রামায়ণ!

ঠানপিসী ছলং করে গানের পিক ফেলে বসে, ঠিক তাই! এই লুচি ভাতার কথাই ভেবে দেখনা তোরা। প্রথমে ময়দাটাকে বেছে নির্মল আর পরিষ্কার করতে হবে। ময়দাতে ঘোঁরের ময়ান দেয়া, সে এক মূল্যবান গুণ। সবাই ময়ান দিতে পারে না। ময়ানটা ময়দার সঙ্গে পুঁচ কুর কুর করে মাখা হলে—তাতে বীরে বীরে জল দিয়ে সানতে হবে। ভালো করে আঙুলের কাষদায় অনেকক্ষণ ধরে সেনে নিয়ে ভবে লেচি তৈরী করতে হবে। তারপর চাকুতি-বেলনায় বেলা। সবাই কিন্তু লুচি বেলেতে পারে না! তিন কোণা, লম্বাটে অথবা এঁকোঁ পেঁকোঁ হয়ে যায়। হাতের কাষদায় লুচিকে ঠিক গোল করে বেলেতে হবে। তারপর কড়াতে ঘী ফুটিয়ে নিয়ে ভাজতে হবে সেই লুচি। যে বাঁধুনির হাতে লুচি ফোলে না—তার নিন্দার দীর্ঘ নেই!

সাত বোন খিলখিল করে হেসে ওঠে—

—ঠানপিসী, তুমি রত্ন-প্রণালী নিয়ে একটি দুধর বই লেখো। কি করে তালের বড়া ভাজতে হয়, কেমন ভাবে খোঁকা তৈরী করতে হয়, কি কাষদায় মোচার খটকে মুখরোচক করতে হয়, গোপ্তর বড়া ভাজতে কি-কি অহুমান লাগে, এই সব শব্দ দিয়ে যদি বই লিখতে পারো, তাহলে সে বই বাঙলা দেশের গিঞ্জীদের হাতে হাতে ফিরবে।

ঠানপিসী হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, আমি কি তোদের মতো লেখাপড়া জানি? আমার সব শেখা মুখে মুখে—চোখে দেখে! তবে হ্যাঁ, রান্না করে খাইয়ে এক সময় দশ গায়ের মানুষকে হাত চাটতে দেখেছি।

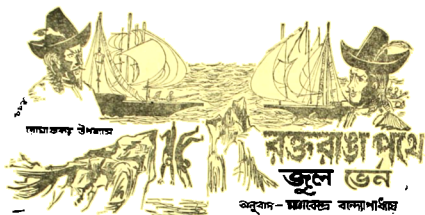
তবে মেয়েরা অবাক হয়।

—বল কি ঠানপিসী। তোমার হাতের রান্না খেয়ে দশ গায়ের মানুষের হাত চাটছে... এমন দৃশ্য সিনেমাতেও কখনো দেখা যায়নি!

আবলা আঙুলে আঙুলে বাড়ে—হামাঙড়ি দেয়—বিছানার এধার-ওধার গড়ার—তখন বোনেরা ওকে যেহেতু বিছানা পেতে দেয়। নইলে—খাট থেকে পড়ে মাথা ফাটাবে। দোলনা এখন বাতিল হয়ে গেছে।

যে দুরন্ত ছেলে.—দোলনার তইয়ে রাখলে হয়ত তার বেলিং ভিতরে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে।

(ক্রমশঃ)



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

‘মাল্লাদের কাক সঙ্গে বগড়া বাঁধিয়ে না কিন্তু পাবলো, শুধু মনে বেধো, এই বিপন্ন সমরে, নিজের দেশকে সেবা করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সব সমরে চোখ-কান খোলা রাখা, সজাগ থাকা, আর তাহাঁতের সময় এসে সব বিশ্বাসঘাতকদের শায়েস্তা করা, শাস্তি দেয়া।’

‘আপনাকে কথা দিচ্ছি, ক্যাপ্টেন, দেশের জন্য আমি মরতে পারি’, একাগ্রভাবে আবেগে ত’রে গিয়ে পাবলো বলতো, ‘হ্যাঁ, দরকার হলে এই হৃৎকণ্ঠাগ বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে গিয়ে আমি মরতেও ভয় পাবো না।’

তিনদিন চড়ে গেলো, জাহাজ দু’টি মারিহানাস্ ছেড়েছে। ‘কোন্স্টান্টিনিয়া’ পাল খাটিয়ে তেজি তাওয়ার স্তব্ধত্ব করে ভেসে চলেছে। নিচু, লাংগো-ভরা জাহাজটির হাল, হালকা তার কাঠামো, মাস্তুলে ধবধবে পেটফোলা পাল—ফেনা আর ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে যেন লাফিয়ে চলেছে জাহাজটি—আর পিচকিরির মতো চড়িয়ে-পড়া লাফিয়ে-ওঠা ফেনার তার আটটা কাবান ঢাকা প’ড়ে যাচ্ছে !

‘বাবো নট বটায়,’ লিউটেন্যান্ট হারতিনেনথকে বললে পাবলো, ‘হাওয়া যদি এ-রকমই থাকে, আর জাহাজ যদি এত জোরে চলতে থাকে, তাহলে তো শিগ’গিরই গিরে গম্বো পৌঁছে যাবে—আর আমাদের সমুদ্রে বুধে বেড়াতে হবে না।’

‘ভগবান করুন তা-ই যেন হয় !’ পথে যে বকি-কাহেলাঁ পোড়াতে ক’লো, তা-ই যশেট—এবার ডাঙায় গিয়ে একটু বিশ্রাম গেলো বাঁচি !’

মাস্তুলের পাহারাদার কোঁজে কাঁচেই দাঁড়িয়ে সব সুনছিলো। তাকে তনিয়ে-তনিয়ে হারতিনেনথ জোরে বললে, ‘শিগ’গিরই তাড়া চোখে পড়বে ব’লে মনে হচ্ছে !’

‘মিনদানাও ঘাঁপ,’ বললে পাবলো, ‘১৪০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা আর ৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ দিয়ে বাজি কিনা আরহা—আর মিনদানাও ঘাঁপ হলো—’

‘১৪০ ডিগ্রি ৩৯ মিনিট দ্রাঘিমা আর ৭ ডিগ্রি অক্ষরেখার অবস্থিত’, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে মার্তিনেথ।

চোখে মুখ তুলে তাকালে, তারপর মার্তিনেথের উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট ইশারা করে সে হস্তদণ্ড হয়ে তার কাছে চলে গেলো।

‘তোমার বুকি এখন থেকে পাছারা দেবার কথা, পাবলো?’ জিগেল করলে মার্তিনেথ।

‘হ্যাঁ, লিউটেনেন্ট।’

‘হু-টা বাজলো। আচ্ছা, আর তোমাকে আটকাবো না।’

পাবলো নিচে চলে গেলো।

মার্তিনেথ গলুইভেই বাঁড়িয়ে রইলো, তারপর তাকিয়ে দেখলে, ‘আসিয়া’র দিকে—‘আসিয়া’ তাদের জাহাজের পাশ ধেঁবেই চলেছে। চমৎকার সজ্জাবেলো, আবহাওয়া ভালো, ঘেঁবে মনে হয় উচ্চ মতলের একটা শান্ত সন্তোজ বন্দর বাড়িবেলো আসন্ন।

সজ্জার কাপশা অদ্ভুতের মধ্যে তাকিয়ে মার্তিনেথ আশ্চর্য করার চেষ্টা করলে পাছারায় কে-কে আছে। চোজেকে সে চিনতে পারলে, আর হুঁজনকে ঠিক শনাক্ত করতে পারলে না, কিন্তু দুই খেকে মনে হলো গুহাফান্-এর সেই সরাইখানার গুপ্তলভার এই হুঁজনও ছিলো।

সোজা সে এগিয়ে গেলো সারেরডের দিকে। নিচু গলার কী ঘেন বললে সে তাকে, ছোট্ট হুঁচারটি কথা, বাস, আর-কিছু নয়।

কিন্তু যদি ভালো করে কেউ খেয়াল করতো তাহলেই দেখতে পেতো সারেরড অমনি জাহাজটার মুখ একশাশে একটু বাঁকিয়ে দিয়েছে, আর অমনি জাহাজটা একেবারে ‘আসিয়া’র গায়ে এসে পড়ে আর কি!

এ-সময়ে মার্তিনেথের যা করবার কথা, সে কিন্তু তা করছিলো না; বরং খোলের মধ্যে পাটাতনের উপর পায়চারি করছিলো, আর সারাক্ষণ ‘আসিয়া’র উপর নজর রাখছিলো। কেমম যেন অবস্থি বোধ হচ্ছিলো তার, ভয়ও হচ্ছিলো খুব, আর সেই জন্মে কথা বলার চোডটা নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে কেবলই নাড়াচাড়া করছিলো।

হঠাৎ বড়ো জাহাজটা থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ উঠলো।

সংকেত হবামাত্র মার্তিনেথ লাফিয়ে ছুটে এলো, চীৎকার করে উঠলো, ‘সবাই! এসো পাটাতনে! পাল নামিয়ে ফ্যালো চটপট!’ _____ (ক্রমশঃ)

টোকিওতে দেখানো মজার শাদু

বাহুসজাট এ. সি. সরকার

টোকিও শহরের সিবানী অঞ্চল একটি খুব জয়-জমার পাড়া। এখানে, হানবাহনের ভিত্তে আর দোকানপাটের চাকচিক্যে কোলকাতার চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকেও হুঁত হার মানায়। সেই সিবানী অঞ্চলের মধ্যমণি সিবানী রেষ্টোঁরা টোকিও শহরের ছোট-বড়-মাকারি সব বাহুকের মিলনস্থল। মাসিক মি: কোভায়া বাহুরসিক আর নিজেও একজন দৌধিন বাহুকের।

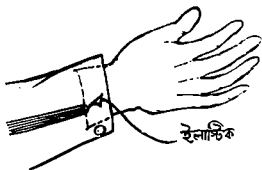
সেই সিবানী রেষ্টোঁরাতে সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে হাজির করলেন মি: কোভায়া ময়:। বাইরে বরফ-পড়া হাড়-কাপানো শীত। কাঁচের দোর ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই ভেতরকার উষ্ণ আমাকে শরীর জড়িয়ে পেল। বেরাটা এগিয়ে এলে গা থেকে গভীর-কোটটা খুলে নিয়ে টুপি সমেত জ্বলিয়ে দিল ব্রাকেটে। আমাকে নিয়ে বাহুরসিকের মজলিসের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে, দীর গল্লীর কঠে মি: কোভায়া ঘোষণা করলেন:

“বহুগণ, আহুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতীয় বাহুকের মি: এ. সি. সরকার।”

সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার হুঁহাতে তখনো দস্তানা পরা। মাথা নীচু করে জাপানী প্রথার ঠেঁদের অভিবাদন জানিয়ে আমি হুঁহাতে থেকে দাঁতানা হুঁটে। খুলে ফেললাম, তারপরে ওহান-ই-বি...ইচি-নি-সান...বলে ও হুঁটোকে উপর পানে ছুঁড়ে মারলাম। সবার চোখের সামনে দস্তানা হুঁটে বেদালুম অসুস্ত হয়ে গেল। বাহুর বহুরা আমার হাততালি দিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

এখন কণা হচ্ছে, কেনন করে এই অসুস্ত দস্তানা ওড়ানোর বাহুটা আমি সেদিন দেখিয়েছিলাম।

একটা খুব সহজ কৌশলেই এই অসুস্ত কাজটা আমি সেদিন হাসিল করেছিলাম। দস্তানা হুঁটোর সঙ্গে লাগানো ছিল হুঁখানা ইলাস্টিকের ফিতে: দস্তানার কজির কাছে একটা ফুটবলেক লগা ফিতে ইলাস্টিকের এক মাথা ব্রডো দিয়ে সেলাই করে আটকে নিয়ে, এই ইলাস্টিকের অন্য মাথাটা আস্তিনের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে কোটের ভেতরে কাঁথের কাছে লাইনিং-এর সঙ্গে সেলাই করে আটকে নিয়েছিলাম। হুঁটো দস্তানাতেই এই কাজ করে নিয়ে আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। হাতে দস্তানা পরার পরে আস্তিনের ভেতরে ইলাস্টিকটা টান টান হয়ে থেকেছিল।



এর পরে হাত থেকে দস্তানা
গুলে, যেই মাত্র আমি তা হাত
থেকে ছেড়ে দিলাম, অবনি
ইলাস্টিকের টানে আপনা থেকেই
তা গিয়ে আজ্ঞার নিল দবার নজরের
আড়ালে কোটের আত্তিনের
ভেতরে। কারদাটা ভালভাবে
বুকে নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে করে
দেখ তোমরাও এই অমৃত ব্যাপারটা।

করে দবাটিকে অবাক করে দিতে পারবে। দরকার হলে "বাহুল্যট এ. সি. দরকার, ম্যাজিক
ভিলা, কলিকাতা-৩১" এই ষ্টকানার বিল্লাই কার্ডে চিঠি দিতে পার।

গঞ্জের হাটে

অপূর্ণ দিল্লী

গঞ্জের হাটে বিকিকিনি হয়
পসরা নামায় লোকে ;
দেহাতি মানুষ মিটিমিটি চায়
কালি-পড়া ছুটি চোখে ।
কঠিন মাটিতে হাঁটাইটি শুধু
প্রাণ বাঁচাবার দায় ;
পোড়াকুটি দিয়ে পেট ভরাবার
দিনগুলি কেটে যায় ।
ওপারের খেয়া এপারের এসে কি
ছ'কুলে নিতালি রচে ;
কে জানে কখন পলিমাটি প'ড়ে
নদীটি কোথায় মজে !

গঞ্জের হাটে বিকিকিনি হয়
খেত-খামারের পুঁজি ;
মানুষের মন কে নেবে এখন
লোক নেই কেউ বুঝি !
বিকেলের আলো আরো ম'রে এলে
পাখিরা ফেরে কি নীড়ে ;
গঞ্জের হাট তখনো মুখর
শত মানুষের ভিড়ে ।
দেহাতি-হৃদয় আশা-নিরাশায়
কোঁপে কোঁপে গঠে হয় !
শীতের বাতাসে আগুনের পাশে
রাতগুলি কেটে যায় !



নেট-ড

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের 'রাবার' জয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের পাতার এক স্বর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হল। 'রাবার' ভারত আগেও পেয়েছে। প্রথম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (১৯৫২-৫৩), তারপর নিউজিল্যান্ড (১৯৫৫-৫৬, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮) এবং ইংলণ্ডের (১৯৬২) বিরুদ্ধে। কিন্তু যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্ট খেলায় ভারত কখনো ময়ী হয়নি সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয় এবং 'রাবার' লাভ শুধু ক্রিকেটের নয়, গৌরবেরও। টেস্ট কেন, পাঁচটা টেস্ট সমেত বোটা তেরোটা খেলায় মথো পরাজয় শুধু একটা।

জর্জ টাউনের তৃতীয় টেস্ট ব্যাচে ড্র হওয়া ছাড়া চারটে টেস্টেই দেখা গেছে ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় লড়াই, আশা-আকাঙ্ক্ষার ঝন্ড, বেকর্ড ভাঙা-গড়া। এই সফর ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাহস ও নৌবর্গের সফর। কোনো বিদেশ সফরে, এমন কী কোনো হোম সিরিজেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মতো এমন একস্তায় পরিচয় পাওয়া যায় নি।

সুনীল গাভাসকার জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশী রান (৭৭৪) করার বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। বিজয় হাঙ্গারের পর টেস্টের দু' ইনিংসে সেফুরি করেছেন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি এখন হলেন গাভাসকার। এবং সেই সঙ্গে এক সিরিজে সবচেয়ে বেশী সেফুরি করার এবং টেস্ট আভারেজে ভারতের প্রথম। আভারেজে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ব্যাডম্যানের পরই এখন সুনীল গাভাসকারের স্থান। সুনীলের আভারেজে ১৫৪.৮০ রান।

ইংলণ্ড ও নিউজিল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চে আরম্ভ হয় ইংলণ্ড ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। টেসে বিজয়ী হয়ে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ৩০ রানের ডেভর চারটে উইকেট পড়ে যাবার পর রুটি অসম্ভব হয় এবং রুটির জন্যে ৮০ মিনিট বেলা বন্ধ থাকে। রুটিতেজা উইকেটে নিউজিল্যান্ডের পরবর্তী বেলোয়ার্ডরা পর পর আউট হতে থাকেন। ফলে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে ৬৫ রানে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। তবে দিনের শেষে ইংলণ্ডও তিনটে উইকেট হারায় মাত্র ৬৫ রানের মধ্যে। প্রথম দিনের বেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংলণ্ডের স্কাট স্পিন বোলার ডেব্রেক আণ্ডারউডের ১২ রানের মধ্যে ৬টা উইকেট লাভ।

দ্বিতীয় বেঙ্গল ডালভেরার লেকুরির ফলে ইংলণ্ড ২০১ রানে ইনিংস শেষ করে ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের বেলায় ২ উইকেটে ৪৪ রান করলে আবার রুটি শুরু হয়। দু' ইনিংসেই নিউজিল্যান্ড দলকে খেলতে হয়েছে রুটি তেজা উইকেটে। তবু নিউজিল্যান্ডের কতিয়ং যে, প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এ তারা তৃতীয় দিনের শেষে, ৮ উইকেটে ২১২ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে।

চতুর্থ দিন ২৪৪ রানে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর আরের অন্য ইংলণ্ডের প্রবেশন থাকে ৮২ রান। ২ উইকেট হারিয়ে ওই রান সংগ্রহ করে তারা বেলায় ক্ষেতে ৮ উইকেটে। ডেব্রেক আণ্ডারউড যিনি প্রথম ইনিংসে ১২ রানে ৬টা উইকেট পেয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৫ রানে ৬টা উইকেট পেয়ে মোট ২১ রানে দখল করেন ১২টা উইকেট।

অকস্মাৎে দু' দেশের দ্বিতীয় টেস্টে টেসে বিজয়ী হয়ে ইংলণ্ড প্রথম দিনে করে ২ উইকেটে ৩১৭ রান। কিন্তু মিডিয়াম পেস বোলার বব কানিলের মাঝামাঝি বোলিংয়ের ফলে ১৪৫ রানের মধ্যেই ইংলণ্ডের ৬টা উইকেট পড়ে গিয়েছিল। শেষ ৭টে উইকেটও পড়ে মাত্র ২০ রানের মধ্যে। সপ্তম উইকেট জুটিতে অ্যালান নট ও পিটার লেভার যোগ করেন ১৪৫ রান। দ্বার মধ্যে উইকেট কিপার নটের ১০১ এবং বোলার লেভারের ৬৫ রান। কানিশ পান ৭৬ রানে ৬টা উইকেট।

দ্বিতীয় দিন ৩২১ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। প্রত্যুত্তরে নিউজিল্যান্ড করে ৪ উইকেটে ২০৮ রান। ৪টে উইকেটই পান আণ্ডারউড। পর দিন ৭ উইকেটে নিউজিল্যান্ড ৩১৩ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৭৮ রানের মধ্যে পড়ে যায় ইংলণ্ডের ৪টে উইকেট।

প্রথম ইনিংসের খেলার ৮ রানের খাটতি থাকতেও এভাবে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে জয়ের কুঁকি নেওয়া নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ডাউলিং-এর সাহসিকতার পরিচয়। যার জন্মে সহ-অধিনায়ক কলিন ক্যাউড্রে ও বেসিল ডাউলিংয়েরা অসুস্থ থাকার সত্ত্বেও হু'জেন রানার নিয়ে ব্যাটিং করতে হয়।

নিউজিল্যান্ডের কাছ থেকে প্রথম পরাজয় এড়াবার ক্ষেত্রে প্রথম টেস্ট সেকুয়ারি অধিকাঠী আলান নট-এর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। নট দীর্ঘ তিনশ মিনিট ধরে নিউজিল্যান্ডের আক্রমণের হোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত ২৬ রানে আউট হন। চাঁপানের কিছু আগে ২৩৭ রানে ইনিংস শেষ হবার পর জয়ের জন্মে ইংলণ্ডের ২৪৬ রানের দরকার থাকে, ওই অল্প সময়ের মধ্যে যা সংগ্রহ করা অসম্ভব। কোনো উইকেট না হারিয়ে তাঁরা ৪০ রান করলে খেলার ওপর ঘননিলা পড়ে। দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফল অসীমায়িত থেকে যায়। বেলা দুটোর পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, আসেনজ-সরী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ড রীতিমতো কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছে।

টেবল টেনিস

টেবল টেনিস খেলার চীন যে পৃথিবীর এক নতুন দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯৬১ সাল থেকে টেবল টেনিসে তাদের জয়-জয়কার। ১৯৬৪ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সাতটা বিজয়ের মধ্যে পাঁচটা বিজয়ে তারা চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছিল। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের বিশ্ব আসরে তারা খেলেনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কারণে।

চ বছর পরে এবার জাপানের নাগোয়া শহরে আয়োজিত বিশ্ব টেবল টেনিসে আবার চীন খোগ নিয়ে দলগত বা দেশগত প্রতিযোগিতা সোয়েদলিং কাপ জয়ের দৌরবও রয়েছে। বাকী তিনটে জয় মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে। পুরুষদের সিঙ্গলসে সুইডেন এবং পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে হাঙ্গেরী। জাপান শুধু মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় কবিলন কাপ লাভের সম্মান পেয়েছে। আর কোনো জয়ের সম্মান পায় নি। দলগত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ভারত পেয়েছে চতুর্থ স্থান, মহিলা বিভাগে ভারতের মহিলাস পেয়েছেন পঞ্চদশ স্থান।

১৯৬১, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে তিনটে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় চুয়াং সেন-জুঙ্গ চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকাঠী হন। বর্তমানে চুয়াং সেন-জুঙ্গের চেয়েও চীনের প্রতিভাধর খেলোয়াড় হলেন লি চিং কোয়াং। চকির বছর বয়সী এই স্রাটা খেলোয়াড় অগূর্ব বস্তুতার টেবলের ওপর তুকান ছুটরে সোয়েদলিং কাপের খেলার হু'জেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে সহজেই পরাজিত করেছেন।

হকি

এবার প্রথম ভিত্তিগন হকি লীগ জয় করেছে মোহনবাগান। এবার মোহনবাগান এগারোবার, এর পের তিনবার অপরাজিত থেকে লীগ জয়ের সম্মান পায়।

মোহনবাগানের লীগ জয় যোগের যোগা সম্মান হলেও লীগ এবার মোটেই জমে নি—খেলা হয়েছে খাপচাভাবে। রাজস্থান, যারা শেষ খেলাটির আগে একটা খেলাতেও জিততে পারে নি, তারা তিনটি অপরাজিত দল—মোহনবাগান, ইস্টার্ন রেল এবং মহম্মেডান স্পোর্টিং তিনটে দলের কাছ থেকে একটা করে পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে। একই কথা বলা যায় লীগ কোঠার সর্বমোহনাবিকারী কাস্টমস সবদেও। ৮টা খেলা থেকে কাস্টমসের সংগ্রহীত পয়েন্ট সংখ্যা ২০। কিন্তু কাস্টমস ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান, দুটো বড় দলের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে এক পয়েন্ট করে কেড়ে নিয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান পরপর ৮টা জয়ের পর কাস্টমসই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আর লীগ রানার্স' ইস্টার্ন রেলের একটান। ২১টা জয়ের পর বাধা হয়ে দাঁড়ায় শক্তিহীন রাজস্থান। তারপরেও দুটো খেলার রেল দলকে পর পর পয়েন্ট হারাতে হয় বি. এন. আর এবং মহম্মেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে। শেষ খেলার এবং চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ক খেলায় ইস্টার্ন রেলকে মোহনবাগানের কাছে চতুর্থ পয়েন্ট হারিয়ে লীগও হারাতে হয়। লীগে রেল হারিয়েছে ৪ পয়েন্ট, মোহনবাগান ৩ পয়েন্ট। এক পয়েন্ট ব্যবধানে চ্যাম্পিয়নশিপের সীমান্স। তবুও চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান একটা করে পয়েন্ট হারিয়েছে কাস্টমস, মহম্মেডান এবং ইস্টার্ন রেল দলের কাছে।

ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে বর্ডার দিকিউরিটি ফোর্স ও মোহনবাগানের মধ্যে বেটন কাণের ফাইনাল খেলা গোলাপ্তর অবস্থায় শেষ হয়। পূর্ব ব্যবস্থা মতো দু'দলকেই বেটনের ঘূর্ণ জরী বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতের স্বাভাবিক হকি দলের প্রায় আট-দশ জন খেলোয়াড় বর্ডার দিকিউরিটি ফোর্স দলের হয়ে খেলেছিলেন, কিন্তু এদিনের খেলার ঊঁয়া যোগাযোগ, আক্রমণ রচনার পরিকল্পনা, ক্রীড়াশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে উন্নত মানের পরিচয় দিতে পারেন নি। মোহনবাগানের খেলা সম্পর্কে এই একই কথা বলা চলে।

ফুটবল

টোকিওতে লজ সমাপ্ত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইজরাইল বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। এবার নিয়ে সূচ্য জয়ের সম্মান সমেত ইজরাইল মোট পাঁচবার বিজয়ী হল। গত তিনবারের বিজয়ী বার্মাকে সেমিফাইনালে এবং শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়াকে ফাইনালে হারিয়ে ইজরাইলের এই জয় কৃতিত্বের।

এবার এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দল ভালোই খেলেছে। গ্রুপ লীগে ফিলিপিনসকে ২-০ গোলে এবং বেলালকে ২-১ গোলে হারিয়ে ১-১ গোলে বেলা ড্র করছে গত তিনবারের বিজয়ী শক্তিশালী বার্মার সঙ্গে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেছে জাপানের কাছে ০-৩ গোলে। বৃষ্টি ভেজা মাঠে এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ভারতীয় দলকে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। পরাজয়ের এটাও একটা কারণ।



(সমালোচনার জন্য প্রকাশিত হই পাঠ্যবই)

আমার বৈশ্ব-শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
পরিকল্পিত এবং শ্রীমদে দে কর্তৃক চিত্রে
রূপান্তরিত। শিল্প সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট
লিঃ. ১১ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড,
কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৫.০০

ছোটদের জন্য এদেশে যে এমন একখানি
বহুভেদের চিত্রশাসিত। মূল্যবান কাগজে
মুদ্রিত, বিচিত্র পরিকল্পনার বই বেকতে
পারে তা বইখানি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত
আমরা যেমন কল্পনা করতে পারিনি, তেমনি
তোমরাও পারবে না। যিনি এর কল্পনা
করেছেন এবং যে শিল্পীসেই কল্পনাকে তাঁর
অনবদ্য কৃতির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন,
তাঁদের হৃৎকেন্দ্রে আমাদের দত্তবাদজ্ঞান।

বইখানির হলটি ও নাবণ্ড থেকে
প্রতিটি পাতা, বধা—আমার প্রথম ফটো-
গ্রাফ, যেদিন আমার জন্ম হ'ল, আমি
জন্মাবার পর থাকা দৈবত্রে এসেছিলাম,
সেদিন যা উপহার পেয়েছিলুম, আমার
জন্ম সার্টিফিকেট, আমার রাশিচক্র, এমন
কি ৪৮ পৃষ্ঠার এই বই যে জন্মদিনে
পাবে ও যে দেব উভয়েই ধন্য হবে। এর
গোড়ার লেখা আছে—

“জীবনের সব চাইতে হৃদয় ও মনঃ
দিনগুলি হচ্ছে শিশুকালের! শিশুর জন্ম
থেকে তার বাইরের জগতের জ্ঞান হওয়া
পর্বন্ত সাতটি বছরের আনন্দময় স্মৃতি এই
অভিন্ন বই এ ধরে রাগলে পরবর্তীকালে

শিশুর মনে জাগবে সুন্দর জীবন গড়ার কল্পনা!”
আমরা তোমাদের সকলকে বইখানি
একবার হাতে নিয়ে দেখতে অনুৰোধ করছি।

—

সেরা সেরা গল্প—শ্রীযুক্ত সুমার
গল্প। সুপ্রকাশনী, ৮বি কলেজ রো,
কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫.০০

ভূতপূর্ব অধ্যাপক স্বরাংত সুমার গল্প
ছোট ও বড়দের সাহিত্যে সমানভাবে
খ্যাতিমান। বিশেষ করে অনুবাদ কার্যে,
গ্রন্থজনক ও বোম্বাকর রচনার তাঁর মত
দক্ষ লেখক খুব কমই আছেন। বহুকাল
পরে প্রকাশিত তাঁর এই গ্রন্থখানি থেকে
তোমরা তাঁর বিশিষ্ট রচনার নিম্নলিখিত উপলব্ধি
করতে পারবে।

বিশ্ব সাহিত্যের খ্যাতিমান ২৪জন
সাহিত্যিকের নানা ধরনের উপাত্তোপা ১৪টি
গল্প এই বইয়ের মধ্যে তিনি অনুবাদ করে
দিয়েছেন। কিন্তু গল্পগুলি অনুদিত হলেও
এত হৃদয় ভরেছে যে, অনুবাদ বলে মনেই
কর না এবং বড়রাও এগুলি পড়লে আনন্দ
পাবেন। বিশেষ করে নেকড়ের ডাক,
কালো বেড়াল, নিয়তির চক্রে, অপরাধী,
বহুতলী, সিংহাল আমাদের আশ্চর্য ও
অতিশুভ করেছে।

বহুভেদের প্রচ্ছদপটটি সকলেরই পুষ্টি
আকর্ষণ করবে। হাস্য ও কাগজ হৃদয়
এবং প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই ছবি আছে।



১। উপরের ছবিটিতে যে প্রাচীন কাহিনীর ঘটনা আছে, সেটি কোথায়, কবে ঘটেছিল এবং কিসে উল্লেখ আছে বলতে পারো ?
—বাস্তবিক

৩। দেখে সবে করে ঘণা
কষক আদরে,
কিন্তু পবিত্র অতি
থাকে পদ' পরে।
জিন অক্ষরে নাম তার
প্রথমে প্রকাশ
আজ্ঞাকর চেড়ে দিলে
চাদনাতলে বাস।

—শ্রীহারা ভট্টাচার্য

৪। পাশের শূন্য বহরগুলো এমন কয়েকটি অক্ষর দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, যাতে প্রতিটি শব্দই এক-একটি উপাধি হয় এবং কয়েকটি উপাধি মিলে এক-একটি পূর্ণ নাম হয়।

১ যেমন প্রথম লাইনে।

দেব, দত্ত, ধর্ম = দেবদত্ত ধর্ম

—শ্রীললিত বাগচী

২। আগার নরে বসবস

গোড়ায় থাকে মৃ
ফুল ধরে না, ফল ধরে না
বেড়েই চলে শুধু।
গরের পাশেই আছে তোমার
কি গাছ বলো তাই,
অনেক রকম খাবার জিনিস
তার দর্যাতে পাই।

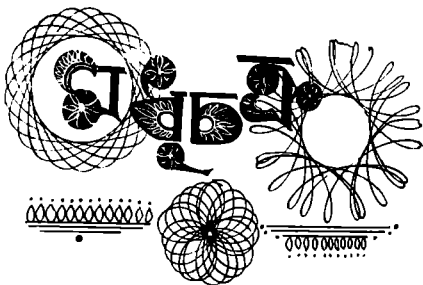
—শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী

দে			তু	শ		X	X
X		কু		দা		ধ	
গৌ				য়			রী
X	ভ		দ্রা			হি	
	ঘ	না				লি	X
X	X		র্জ			ঝি	X
	খ		লী			ন	X
X	মু	রা			হা		য়

(উত্তর আগামীবার বেরাবে)

৥ গজ মাসের ধাঁধার উত্তর ৥

১। যেতাল ২। সুজিবর ৩। নাটক ৪। বিষবৃক্ষ ৫। বাইকেল



জৈষ্ঠমাসের ১১ তারিখটার ভয়েছিলেন বিব্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তোমরা যখন এই লেখা পড়বে তখন অবশ্য তারিখটি চলে যাবে, কিন্তু শুধুও তাঁর তুমুদিনটি তোমাদের আনন্দের সকলেরই মনে রাখা দরকার। তোমরা অনেকটাই জানো—তিনি এখন শ্রুতিশক্তি হারিয়েছেন, চুপ করে বসে আছেন। শ্রুতদৃষ্টিতে তাকিয়েও দেখেন, কিন্তু কিছুই বোঝেন না। তাঁর সামনে কতকগুলি কাগজ তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। তাঁর প্রতিবারের তুমুদিনে বাড়ীতে উৎসব চহ। উৎসব ছাড়াও সকলে যাতে কবিকে দেখতে পায় তার ব্যবস্থাও করা হয়—লাইন দিয়ে লোক যায়, তাঁকে দেখে—কিন্তু হার! কবি কিছুই বোঝেন না। আমাদের বড়রা বা আমাদের যারা তাঁকে সুস্থ অবস্থায় দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, কথা বলেছি, তাঁর উদ্দীপ্ত লেখনীর ভাষা তাঁর মূখ থেকে শুনেছি—তারা স্তব্ধ হয়ে বাই। মনে হয় বিশেষ করে আমাদের দিনে সেই তেজোদগ্ধ ভাষণ বা রচনার প্রয়োজন যে কত ছিল—বিনি একদিন শিকল ছেঁড়ার গান শুনিযেছেন আজ তিনি নিজেই অসুখ শক্তির দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছেন।

গ্রাম বাংলার ছেলে তিনি। আর পাঁচটা ছেলের মতই জুইমি করে মূল পালিয়ে, গুরে বেড়িয়েছেন। সেদিন এই আবির্ভাবের কথা কেউ ধারণাই করেন নি—দুখ মিজাকে দেখে (মায়ের কয়েকটি সন্তান মারা যাবার পর—এটি তার ডাকনাম হয়েছিল)—মনে হতো একেবারেই একটা সাধারণ ছেলে। কিন্তু একদিন তিনি প্রদীপ্ত বহির্বিষার রত বিব্রোহ

বরণকারকে তৃপ্তি কলেন। সেই পরাধীন দেশের মানুষের রক্ত চকল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—

“নাচে এই কালবোশেখী
কাটাধি কাল বলে কি
সে যে সেপি
ভীষ করার এই ভিত্তি বাড়ি।
লাধি হার ভাঙরে ভাল।
বত সব কন্দীশালার
আদন আলা
আগুন আলা, ফেল উপাড়ি।”

আজকের প্রার্থনা আমাদের ঠাঁকে দিয়ে।

তোমাদের অনেকের পি. ইউ ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরে আমাদের চারিদিকে বা অবস্থা চলেছে, তার জন্য পড়াশুনা বা সব কাজই বিঘ্নিত হয়েছে। অনেকে অনেক অস্থিবিধার মধ্যে পরীক্ষা দিচ্চ। তোমাদের একাগ্রতা সাফল্য এনে দিক এই কথা ধার ধার বলি। আতঙ্কিত পরিবেশ আর অস্থিতকর জীবনযাত্রার শেষ যে হবে জানি না, তবুও অবিচলিত হয়ে আমাদের স্বপ্ন পরিবেশ আনার চেষ্টা করতে হবেই একথা মনে রেখো। মৌচাকের প্রাক্তন সভ্য অধিত চক্রবর্তী কর্ম উপলক্ষে আমেরিকাতে আছে। সেখান থেকে সে মাকে মাকে দু' স্বপ্ন চিঠি লেখে। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, গত বছর পূষার সময় তার একটি চিঠি তোমাদের উপহার দিয়েছিলেন। এখন সে ওহিওতে (Ohio)-তে আছে। কিছুদিন আগে যে চিঠি এসেছে, তাও কিছু অংশ তোমাদের পড়ানি— চিঠিখানা লেখা ১৪৭৭-এ।

—“এখানে এখন Rainy Season শুরু হয়েছে। এখানে শীতের পরই বর্ষার প্রকোপ। শীতের ক'বাস প্রচণ্ড বয়ত, চারিদিকে সাধা, কেবলই সাধা। গাছের পাতা কয়ে গিরে কংকালের মত ঝড়িয়ে আছে মনে হতো। এখন ধীরে ধীরে ছোট ছোট পাতা গজাতে শুরু করেছে। বৃষ্টির ক্ষেত্র চলেবে সেই May মাসের গোড়া পর্যন্ত। তারপর এখানে আসবে Spring Season। Spring এ মাকি এখানের দৃশ্য অপূর্ব। এখানের বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বাংলা দেশের বৃষ্টির বেশ মিল আছে। তবে বাতাসে সোঁদা সোঁদা গন্ধ নেই, আর নেই শুকনতার মর্দরঙ্গনি। কারণ এখন একমাত্র পাইন গাছ ছাড়া আর সব গাছেরই

পাতা করে গেছে। ভারী নজর ব্যাপার হলে যে, শীতে একমাত্র পাইন গাছের পাতা করে না। সেই কারণে টাইমাসে এরা পাইন গাছের ভাল সানিমে বড়দিনের উৎসব পালন করে। প্রথা আছে, যীত সন্ধ্যার পর অন্ত্রাজ গাছ নাকি উপহারস্বরূপ তাঁকে ফুল ফল ও বাহারি পাতা দিয়েছিল। পাইন গাছের না আছে কোন ফুল বা ফল, না আছে বাহারি পাতা। তাই সে এক পাশে দাঁড়িয়ে শুণু কাঁদছিল। সেই কারণে যীত দম্পত্যবল হয়ে তাকে বললেন যে, প্রচণ্ড শীতে যখন সব গাছের পাতা ঝরে বাবে, তখন শুণু পাইন গাছের পাতা ঝুঁটু আকারে, এবং বড়দিনে পাইনের ভাল দিচ্ছে লোকে উৎসব করবে। এই রকম প্রবাদবাক্য আমাদের দেশের কত গাছ নিয়েও রয়েছে। সব দেশেই প্রায় এইরকম প্রবাদ এবং প্রথা—শুণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

এখানে থেকে নিয়েগ্রে ফলস্ ২২৫ হাইল দূরে। আগামী বে মাসের মাঝামাঝি ওখানে যাবার চেষ্টা করবো। আর ওখানে যে সব ছবি ভুলবো আপনাকে পাঠাবো। ঐ সময় Canadaতেও যাবো কারণ Canada ও USA-এর border-এ হলো নিয়েগ্রে। Canadian side থেকে নিয়েগ্রার দৃশ্য নাকি আরো চমৎকার।"

চিঠিটি বেশ ভাল লাগলো বলে এর শোনানাম। প্রার্থনা করি অন্তঃমস্তির শেষ হোক।

ভোমাদের

স্বপ্নদী

বিশেষ জ্ঞপ্তি

গত বৈশাখের মৌচাকে এবং এ মাসেও ধারাবাহিক অসমাপ্ত উপন্যাস "তববুরে কুকুর-স্যাংগো" অবেরা স্থান্যভাবে প্রকাশ করতে পারিনি। আগামী মাস থেকে যথারীতি তা আবার প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক : শ্রীমুখ্যের সরকার

শ্রীমুখ্যের সরকার কর্তৃক ১৫, বড়ির চারুয়ে টিউ, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকল্যাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৫ই-এইচ-১৭, বোয়ালগান টিউ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : '৬০ পরলা